মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

ডিসেম্বর, ২০২৪
অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সূচীপত্র

২২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

আনন্দময় পরমচেতন সদাই অন্তরমাঝে রয়েছেন		৩
ব্রহ্মলাভের নানা পথ বৈচিত্র্য	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
ভগবানই সত্যচেতন স্বরূপ	তুলি চ্যাটার্জী	১২
সত্যের পথেই ভগবান লাভ	সায়ক ঘোষাল	১৩
এক	মনোজ বাগ	১৫
শ্রীঅনির্বাণের আত্মচিন্তা প্রসঙ্গ	আশুরঞ্জন দেবনাথ	১৮
Discovering Inner Reality : Look Within	—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee	২১

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

আনন্দময় পরমচেতন সদাই অন্তরমাঝে রয়েছেন

জগতের সব মালিন্য যন্ত্রণা, অবসাদ, অপ্রাপ্তি আর বেদনাকে পিছনে সরিয়ে অন্তরে ডুব দিলেই আনন্দের সন্ধান মিলবে। যা কিছু জীবনের সমস্যাদি তার অবসানে চাই অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করা। ভগবান স্বয়ং নিরাবয়বে বিরাজ করছেন সব জীবের অন্তরে। সাদরে বরণ কর ভগবানকে হৃদয় প্রকোষ্ঠে। তিনিই স্বয়ং মধু সৃষ্টিকারী, অন্দর মাঝে তিনি স্বয়ং মধু হয়ে বিরাজ করছেন জীবের কাছে অন্তরের মধু বন্ধু হয়ে। মধুময় তিনি কৃপায় ভরপুর। অন্তর মাঝে ভগবানকে বরণকরে কর্মের প্রবাহে এগিয়ে চলবে যে জীবন সেই পাবে পরিণামে আনন্দময় সদাশিবের জীবন পরশ। সত্য-জ্ঞান-ভালবাসায় ক্রমে ভরপুর হয়ে এ জীবন পেয়ে যাবে আনন্দের সন্ধান।

একান্ত নিবেদনে হোক হৃদস্পর্শী ঃ
অয়ু তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃ স্মৃক অন্ত শশষংতমঃ। / অথা সোমম সুতং শিবঃ।
বিশ্বমিত্র সবনং সূতম ইন্দ্রমদায় গচ্ছতি। / বৃত্রহাঃ সোম সোমপীতয়ে। (ঋ. বে. ১/১৬/৭-৮)
চেতন ধারার মধু সুধা হোক ব্যাপ্ত জীবনের পর্বের উত্থানে।
চেতন স্রোতের নিত্য নবীন পর্বে তোমায় করতে পূর্ণত্বে বরণ।
চেতন ধারার অন্তঃ শরীরের যা কিছু সম্ভার সাধন পর্বে হোক তার পূর্ণতা।
এস এগিয়ে করহে বরণ সাধন চেতন পর্বের সব নিবেদন জীবনে।
বিশ্বের সকল অদিব্যের প্রভাব করে অতিক্রম এসেছে দিব্য পরশ।
করতে জীবনের নবীন পথ রচনা তোমার দেবপ্রয়াসের সব পর্বে।
এখন হবে সঞ্চার অনুপম আনন্দ দেবতায় করে আহ্বান।
জীবনের পথে চেতন পর্বে তোমারই নিত্য আনন্দের মধুময় আবেশে।।

দেবত্বের হোক বিপুল বিস্তার ঃ
সঃ ইসং নঃ কামম অপৃণঃ গোভিঃ অব আ বৃণে।/স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ।
ইন্দ্রঃ বরুণ অহ অয়ম্ সম্রাজোঃ অব আ বৃণে।/ তা নো মূলাত ইদৃশে।। (ঋ. বে. ১/১৬/৯, ১/১৭/১)
তোমার ঐ দিব্য চেতন প্রবাহ এসেছে জীবনে হয়ে মূর্ত।
প্রজ্ঞার স্রোতে করতে ভাস্বর জীবন পথের সব প্রাবল্যে।
করতে ভরপুর আকুল আবেদনে হৃদয়-মনে তোমারই জাগরণে।
দেবতা তোমায় করেছি বরণ ঋষির সাধন ধারায় করে অবগাহন।
নিত্য বিবেকে নিত্য স্পন্দনে তোমার অনন্ত প্রভার সাধন মার্গে।
দেবতা তেমার উপস্থিতি জীবন মাঝে এসেছে প্রশান্তি।
হৃদয় হয়েছে ভরপুর ব্রহ্ম আবেশে তোমায় করতে আহ্বান পূর্ণ প্রকাশে।
তোমারই আনন্দে এস হে দেবতা করি বরণ একান্তে সমর্পণে।

মধুবিদ্যায় যাজ্ঞবল্ক ঋষি বললেন সবই মধুময়। যখন অন্তর মাঝে আসবে প্রশান্তি একমাত্র তখনই এই বোধ জাগ্রত হবে। প্রশান্ত মন বুঝবে এই সমগ্র সৃষ্টির ভগবানের দান। যা কিছু মানুষ হয়েছে সবই ভগবানের দান। ব্রহ্ম সনাতন এই সৃষ্টির মূলে করেছেন মধু সঞ্চার। মধু হল আনন্দ। নিজের জীবন জগৎ সবই আনন্দ মুখর হয়ে উঠতে পারে যখনই বোধ হবে সবই ভগবানের আকুণ্ঠ দান। মানবের জীবন মাঝে ভগবৎ দান যদি কখনও সুখের প্রবাহ ও আপন করে নিতে হয়। ক্রমে দুঃখের কাঁটার বিদ্ধ করবার সামর্থ হারিয়ে যায়। এর আর জীবন মূল্য থাকে না। সুখের লোভে ছুটতে থাকলে দুঃখের ডালি এসে যায়। একবার এই বোধ যদি আসে জীবন ভগবানের দান — এর অন্তরকে মধুবিহীন হতে দিতে নেই। সমস্যাদি দুঃখ এসবের মধ্যে ডুবে গেলেও ভগবানকে আঁকড়ে থাকতে হয়। তিনি জীবনের মাঝে দিব্য সূর্য হয়ে জীবনের প্রতিটি কর্মের মধ্যেকার অন্ধকারের কণাকে আলোকিত করে দেবেন। সমাদরে গ্রহণ কর ভগবানের অমূল্য দান, এই জীবনটি যে মনটি দুঃখ-সুখের প্রতি সমানভাবে নিরপেক্ষ সেই পারে এই জীবনের পথ চলার মাঝে আনন্দের পরশ পেতে। আনন্দ যেন মধুস্রোত। জীবনের পথ চলায় যখন অন্তরের গভীরে দৃষ্টি যাবে, নির্মোহ চিত্তে যখন তার অনুধাবনে মন-প্রাণ-হৃদয় ব্রতী হবে তখনই জীবনের জড় চেতনের কাছে জগৎ মধুর উন্মোচন ঘটবে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক বললেন ঃ

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধুঃ। অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বানি ভূতানি মধুঃ।
যঃ চ অয়ম্ অস্যাম পৃথিব্যাম তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ
যঃ চ অয়ম্ অস্যাম পৃথিব্যাম তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ
অয়ম্ এব সঃ, যঃ অয়ম আত্মা। ইদম্ অমৃতম। ইদম ব্রহ্মঃ ইদম্ সর্বম্।। (বৃহঃ উঃ ২/৫/১)

এই পৃথিবী সব মানুষেরই আত্যন্তিকে মধু। সব প্রাণী এই পৃথিবীর বুকে রয়েছে পৃথিবীতে মধুত্ব সঞ্চার করতে। ঐ পরম পুরুষ তিনি আত্যন্তিকে তেজোময় অমৃতময় অথচ অক্ষর পুরুষ হয়ে নিজে অরূপে সকল রূপের মাঝে সদাই বিরাজমান। তিনি স্বয়ংই মধুময়। অমৃত পুরুষ তেজোময় হয়ে রয়েছেন। ইনিই অন্তর মাঝে দিব্য চেতনের মধু সঞ্চার করলেন। এই অক্ষর পুরষ স্বয়ং মধুবিস্তার করে চলেছেন জীবের অন্তর মাঝে আত্মা রূপে ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং বিরাজ করছেন। ইনিই মহাশিব, সচ্চিদানন্দ পরম প্রকাশ।

—ঃঃ—

ব্রহ্মলাভের নানা পথ বৈচিত্র্য

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধন প্রস্তুতি ঃ সাধনা স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত। প্রত্যেকের সাধনমার্গ স্বতন্ত্র। একই সাধারণ-ধারার মধ্যে থেকেও প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরেই এগিয়ে চলেন। একটি সাধারণ ধারার সাধনাপ্রবাহ থেকেই সূত্র ও রসদ আহরণ করে ব্যক্তি ক্রমশঃই তার সাধনক্ষেত্রের মধ্যে এগিয়ে চলেন। ব্যক্তির এগিয়ে চলার পর্বে উপাদানগুলি আসে দু'ভাবে ঃ ব্যক্তির অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ থেকে। একই বৈষ্ণবধারার সব সাধকই একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনে চলেন না। শাক্ত ধারার ক্ষেত্রেও একই কথা। দু'জন শাক্ত পথগামীর ধারা এক নয়। দু'জনের সাধন ধারায় যেমন রয়েছে মৌলিক ঐক্য তেমনি ধারা দু'টি প্রচুর বৈসাদৃশ্যে ভরপুর। বেদান্তের ধারার ক্ষেত্রেও তাই। দু'জন বেদান্ত পথগামীর প্রত্যয় একই কিন্তু প্রত্যয়ের মাত্রার তফাৎ রয়েছে। তাই সাধন পথে এসেছে অনিবার্য বিভিন্নতা। ব্রহ্মের নিরঞ্জন, নির্বিশেষ রূপের সাধন ব্যক্তির নিজস্ব চৈতন্যস্তরের উপর নির্ভরশীল। সাধক যদি জাগ্রত চৈতন্যের অধিকারী হন তবে ব্রহ্মের প্রজ্ঞানরূপ, সৎ-চিৎ ও আনন্দরূপ তাঁর উপলব্ধির মধ্যে চলে আসে। অন্যথায় ব্রহ্মের চিন্তা, ভাবনা, উপলব্ধির হয় অন্য সোপান। ব্যক্তির চৈতন্যস্তরের উপরই নির্ভর করে ব্রহ্মপথযাত্রা। এক্ষেত্রেও ব্যক্তির সাধনসোপান এবং সাধনমার্গ স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত হয়। অন্য আর সব মার্গের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সাধকের সাধন পথ স্বতন্ত্র। সাধনার পথ স্বতন্ত্র বলেই সাধনা ব্যক্তির অধীন। সাধনা সাংগঠনিক বা সমষ্টির পথে হয় না, এটি ব্যক্তিরই নিজস্ব। সংগঠন বা গোষ্ঠীর ভূমিকা অন্যত্র, ব্যক্তিকেই অর্জন করতে হয় সাধনধন। এই পথের সহযোগী শক্তি ও সাহচর্য দান করে গোষ্ঠী বা সংগঠনগুলি। ব্যক্তির প্রয়াস যাতে বাধাহীন হয়ে ওঠে এজন্য গোষ্ঠী বা সংগঠনকে উদ্যোগী হতে হয়। গোষ্ঠীর উদ্যোগ মূলতঃ বাতাবরণ সৃষ্টি বা উৎসাহ সংযোজনেই ব্যাপৃত। সংগঠনের নানা রূপ হতে পারে। এটি সমাজ বা রাষ্ট্রীয় স্তরের হতে পারে। সামাজিক স্তরের যে সমস্ত সংগঠন এদের সকলেরই ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণে আমরা দেখি রাষ্ট্র তার ভূমিকা কিভাবে পালন করছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এসেছেন মহারাজ দশরথের কাছে. রাজার কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর হাতে তুলে দিতে।

> "সপুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্।।
> কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুর্মর্হতি।" (রামায়ণ, ১/১৯/৮, ৯)

সিংহের মত পরাক্রমশালী, সত্যস্বরূপী, অপরূপ রূপবান জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে আমার হাতে তুলে দিন—এই দাবি ঋষি বিশ্বামিত্রের। কারণ তপোবনের তপস্যা ও যজ্ঞকর্মে ঋষিদের সাধন পর্বে প্রবল বাধা সৃষ্টি ও অত্যাচার করছে পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ। তাড়কা, মারীচ, সুবাহু ইত্যাদি অসংখ্যা রাক্ষসরা যজ্ঞকর্ম সম্পূর্ণ হবার মুখে উৎপাত সৃষ্টি করছে। যজ্ঞের অগ্নিতে উপর থেকে রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা বর্ষণ করে যজ্ঞ পণ্ড করে দিচ্ছে. ঋষিরা নিজেদের তপঃশক্তির প্রয়োগেই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু বিষয়টি রাজার এক্তিয়ার ভুক্ত তাই রাজার কাছেই দাবী। ঋষি বিশ্বামিত্রের যে কোন ইচ্ছা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও রাজা দশরথ এখন দ্বিধাগ্রস্থ। রামের বয়স মাত্র পনের বৎসর। তাছাড়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার নেই। বিশাল রাক্ষস কূলকে প্রতিহত করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়—দশরথের এরকমই বিশ্বাস। তাই তিনি ঋষির কাছে আর্জি জানালেন বিকল্পের। তিনি প্রস্তাব দিলেন স্বয়ং তিনি তাঁর লক্ষাধিক সৈন্য ও অন্যান্য বাহিনী নিয়েই যাত্রা করবেন রাক্ষসসংহারে। বিশ্বামিত্র বললেন কাজটি একমাত্র রামের পক্ষেই সম্ভব। অন্য কারোর পক্ষে এটি অসম্ভব তাই রামকেই চাই। তিনি রাজার ব্যবহারে বিরক্ত ও রুষ্ট হলেন। অবশ্য ঋষি বশিষ্টের হস্তক্ষেপে ও আশ্বাসে দশরথ রাজি হলেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণ বনে গেলেন। বিভিন্ন আশ্রম ও পথ পরিক্রমার পর রামের রাক্ষসনিধনপর্ব শুরু হল। ভয়ঙ্কর তাড়কা দিয়ে শুরু। একের পর কে রাক্ষস দমন ও নিধন করে রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিদের আশ্রমগুলিকে ভয়মুক্ত করলেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমটিকে সিদ্ধাশ্রম বলা হত। এখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণু বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করেছেন। বামন অবতারে ভগবান বামন এখানে বহুকাল যাবৎ তপস্যা করেছেন। ঋষি বিশ্বামিত্রেরও এটি তপোভূমি। তিনি তপস্যায় ও যজ্ঞকাজে রাক্ষসদের দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছিলেন। বৈদিক যজ্ঞ করলে যজ্ঞের

সমস্ত প্রস্তুতি, অনুষ্ঠান শেষে যখন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির পর্বটি আসে তখনই মহা প্রতাপশালী রাক্ষসরা এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আকাশ থেকে কাঁচা মাংস, রক্ত, বিষ্ঠা ছুঁড়ে দেয় যজ্ঞের বেদিতে ও অগ্নিতে ফলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না।

দশরথের কাছে যখন মাত্র দশরাত্রির জন্য রামচন্দ্রকে চাইতে গিয়েছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র, তখনই তিনি রাজাকে বলেছিলেন, তপঃশক্তির প্রভাব খাটিয়ে ঋষিরা এসব দুর্বৃত্তকে সংহার বা ধ্বংস করতে সমর্থ, কিন্তু সেটা তিনি চান না। এটি রাজার কর্তব্য, রাজাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। বস্তুতপক্ষে ঋষি বিশ্বামিত্রের সংগ্রহে যে সমস্ত বিশেষ ধরনের দিব্যাস্ত্র ছিল তার প্রয়োগেই রাক্ষস নিধন নিমেষে সম্ভব ছিল। বিশ্বামিত্র এসব অস্ত্র উজাড় করে রামচন্দ্রের হাতে মন্ত্রসহ অর্পণ করেন। প্রথম যুদ্ধটি রামচন্দ্র নিজ অস্ত্রে করেছিলেন—এটি তাড়কা রাক্ষসীকে বধ। এর পরবর্তী যুদ্ধ গুলিতে রাক্ষস নিধনে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি বিশ্বামিত্রের দেওয়া। এসব অস্ত্রের প্রয়োগ ও প্রত্যাহার উভয়ই বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে শিখিয়ে দেন। রাবণ বধ, কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ সহ অন্যান্য মহাবলশালী ও বরপ্রাপ্ত রাক্ষসদের নিধনকার্যে শ্রীরামচন্দ্র এসব দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ প্রভূত পরিমাণে করেছেন।

রাজার বা রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্যক্তির জন্য একটি অধ্যাত্ম অন্বেষণের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দেওয়া। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রগুলি বেশিরভাগই হয়ে উঠেছে সেকুলার। ফলে রাষ্ট্র ব্যক্তির আন্তর্জাগরণের আনুকূল্য সৃষ্টি ব্যাপারে উদ্যোগী হতে উৎসাহী নয়। পক্ষান্তরে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জগতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তেমন নেই। অধ্যাত্মপিপাসুর পক্ষে প্রতিরোধী শক্তিগুলির সমাবেশ ঘটেছে সমাজে, বাজারে। সমাজ ব্যবস্থার যে গ্রন্থি এখন প্রকট হয়েছে তার বেশিরভাগই দেনা-পাওনা বা কমার্স। কমার্সই ব্যক্তির জীবনকে গ্রাস করেছে। কমার্সের প্রভাব এসেছে সম্পর্কগুলির মধ্যে। দেনাপাওনার হিসেব নিকেশ চলে এসেছে জীবনের সব অঙ্গে, সব সম্পর্কের মধ্যে। পাওয়ার টানে টানে চলে দেওয়ার হিসাব। চাওয়া-পাওয়া দিয়ে চলেছে সম্পর্কের বিন্যাস। এটি জীবনের সবক্ষেত্রেই বর্তমান। ব্যক্তি বা সংস্থা উভয়েরই চলার মধ্যে ফুটে উঠেছে স্বার্থবোধের পীড়ন। স্বার্থ কতটা পূর্ণ হোল, সুরক্ষিত হোল তার উপরই ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে সম্পর্কের জালগুলি। অবশ্য এ সবই দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তির সমর্থনের উপর।

সাধনা ব্যক্তির ধন, তাই ব্যক্তিকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কমার্সের ভিত্তিতে যে সহযোগ জীবনের সবক্ষেত্র দাবী করে অধ্যাত্মক্ষেত্রেও সেটিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে কি না। ব্যক্তির ভিতরের প্রবৃত্তির উপরই নির্ভর করে নির্বাচনটি। বুঝে নিতে হবে কী চাই। চাওয়ার মধ্যে আর দশটা থাকলেই এসে যাবে অন্য নির্ভরতা। আর সে সূত্রেই কমার্স প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। ভগবানকেই যিনি চান তাঁর দৃষ্টিতে অন্য আবিলতা থাকে না। বিরাট কিছু করব, নিজের প্রতিষ্ঠা বা নিজ পছন্দের জনের প্রতিষ্ঠা, বা অন্যান্য পাওনার হিসাব এই ব্যক্তির কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এসব দশরকম ব্যক্তির মধ্যে যতক্ষণ চলে—তা সে যে নামেই চলুক না কেন, ভগবান সেখান থেকে যোজন তফাতে। আর দশটার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চললে অন্য অনেক কিছু হতে পারে। নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা হতে পারে; বড় বড় উদ্যোগও সার্থক হতে পারে; নিজের মত ও মতস্রষ্টার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সবই হতে পারে কিন্তু ব্রহ্মলাভ থেকে যায় শুধুমাত্র অনুমান নির্ভর হয়ে।

ব্যক্তিকে চিনে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে কী চাই। বিশ্বামিত্র রাজা দশরথকে বলেছিলেন, যে সমস্ত ভীষণ রাক্ষসদের দমন ও বধ প্রয়োজন তা স্বয়ং দশরথ ও তাঁর কয়েকলক্ষ সৈন্য, হস্তিবাহিনী, রথবাহিনীর সাধ্য নয়; এ কাজটি একমাত্র রামই পারবেন। এরা সব রামের হাতেই বধ্য। পনের বছরের নবীন যুবক রাম একাই রাজা এবং তার লক্ষাধিক সৈন্যের বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি উপযুক্ত। কারণ তিনি স্বয়ং রাম, নবদূর্বাদলশ্যাম। রামেরই উদ্বোধন চাই। অন্তরের অন্তস্থলে রামচন্দ্রের উদ্বোধনই প্রস্তুত করে দেবে উন্মুক্ত সাধন মার্গ, ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত সরণি।

সাধন সোপান ঃ সাধনার প্রথম পর্বটি নির্বাচন বা চয়েস। নির্বাচন যত সঠিক ও ঐকান্তিক হয়ে উঠবে সাধন পথটি হবে ততই মসৃণ ও মধুর। সাধনার দ্বিতীয় পর্বটি হোল মনন। নির্বাচিত পথেই চলবে মনন পর্ব। মনন যোগের ধারায় ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এটি ব্যক্তির আন্তর-প্রক্রিয়া। সাধনার তৃতীয় পর্বটি হোল অনুরাগ। অনুরাগে ভরপুর ব্যক্তি এখন শুধু আন্তর বাতাবরণই নয় একটি বাহ্যিক বাতাবরণও সৃষ্টি করেন। অনুরাগ ক্রমশঃই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে নির্বাচিতকে একমাত্র করে তোলে। সাধনার চতুর্থ এবং শেষ পর্বটি হোল সমর্পণ। সমর্পণেই সাধকের বা ভক্তের যাত্রাপথের উদ্যোগের পরিসমাপ্তি। এরপর সাধক নিজ অস্তিত্বকে আর নিজস্বতার রঙে রাঙাবেন না। ক্রমশঃই বিলুপ্ত হয়ে একসময় পূর্ণ নির্বাসিত বা নির্বাপিত হয়ে যাবে স্বাতন্ত্র্যের

দীপটি।

সাধনার প্রথম পর্ব ঃ নির্বাচন বা চয়েস্ ঃ নির্বাচনের ওপরই নির্ভরকরে সাধনপথ বা সাধনজীবন কেমন হবে। বিভিন্ন মতাশ্রয়ী ব্যক্তিরা তাঁদের স্ব স্ব মতানুযায়ীই নির্বাচন পর্বটি সারেন। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, শৈব ইত্যাদি মত বা পথের ব্যক্তিরা তাঁদের নিজ তত্ত্বানুযায়ী নির্বাচনটি করে থাকেন। নির্বাচনের বিভিন্ন দিক এবং মাত্রা থাকে। যেমন সাকার বা নিরাকার অথবা অন্য কিছু। যাঁরা ভগবানকে জীবনে চান, প্রাথমিক নির্বাচন পর্বটি তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন। ঈশ্বর আছেন কী নেই; থাকলে কীভাবে আছেন? এসব প্রশ্ন সাধকের কাছে অবান্তর। সাধক ঈশ্বরকে চান। ভগবানকেই চয়েস নিবেদন করেছেন। প্রাথমিক চয়েসটির মধ্যে যেমন রয়েছে সতর্ক অভিযান, তেমনিই অসতর্কতার প্রভাব। ভগবানকে চয়েস যিনি করেছেন, তিনি এখনও ভগবানকে একমাত্র করে তোলেননি। দু'একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই নির্বাচনটি প্রকৃত অর্থবহ হয়ে ওঠে না। ভগবানকে চাওয়া বহু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতীকি হয়ে ওঠে। অন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভগবানকে চাওয়ার সঙ্গে থাকে আরও অনেক কিছু চাওয়া। জাগতিক প্রতিষ্ঠা — অর্থ, প্রতিপত্তি, নাম, যশ ইত্যাদি ছাড়াও থাকে সূক্ষ্ম চাওয়ার দ্যোতনা। যেমন অন্য নাম বা প্রতীকের প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরে নিজের অহংকে পুষ্ট করা। সেবা পরিষেবা বা ত্যাগের আঙ্গিকে নিজের রুচি বা আকাঙ্ক্ষার জীবনপত্তন। নির্বাচন পর্বে অহং সহযোগী ও প্রতিরোধী উভয় ভূমিকাই পালন করে।

অহং-এর সহযোগী ভূমিকার প্রথম কথা নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। নির্বাচন পর্বটি এখন ব্যক্তির কাছে জরুরী হয়ে ওঠে। কারণ ব্যক্তির অধ্যাত্মপিপাসা তাঁর অহং-এর সমর্থন ও সহযোগ পেয়ে যায়। ফলে নির্বাচনটি হয় ব্যক্তির সংস্কার, স্বভাব ও রুচির নিরিখে। অর্থাৎ সংস্কার, স্বভাব ও রুচির বিচারে যে পথটি এবং পথশেষের লক্ষ্যমাত্রাকে চিনে নেওয়া হয় সেটি ব্যক্তির অধ্যাত্ম উন্মেষের সহায়ক হয়। যাঁর বৈষ্ণব সংস্কার ও স্বভাব তাঁর পক্ষে বেদান্ত অনুপযোগী। নির্বাচনপর্বে অহং-এর দীপ্তি যুক্ত হলে বিচার ও পর্যালোচনার দ্বারা ব্যক্তি ক্রমশঃই সঠিক চয়েসের দিকে এগিয়ে চলবেন। সংস্কারকে অহং-এর আলো দিয়েই সহজে চেনা যায়। সংস্কার ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়, দীপ্যমানও। সংস্কারের দু'রকম প্রভাব রয়েছে ঃ দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী প্রভাব এবং অন্যটি স্বল্পমেয়াদী বা অস্থায়ী প্রভাব। স্থায়ী প্রভাব বিস্তারিত হয় ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা, পক্ষান্তরে অস্থায়ী প্রভাব বিস্তৃত হয় ব্যক্তির ব্যবহারে। কোনও কোনও সময়ে ব্যবহার চরিত্র সম্মত হয়ে যায়, আবার নাও হতে পারে। চরিত্রানুগ ব্যবহার ব্যক্তিরপক্ষে চিরন্তনী। এটি ব্যক্তির অস্তিত্বজাত সত্যে বৃত। অন্যদিকে ব্যবহার যদি চরিত্র সম্মত না হয় তবে এটি ক্ষণস্থায়ী মাত্রা পায়। চরিত্র ব্যতিরেকী ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে আরোপিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র চিন্তার বিক্ষেপ। বাইরের পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে ব্যক্তি যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নিজ ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করেন ও উপস্থাপন করেন তখনও ব্যবহারটি হয়ে ওঠে কৃত্রিম। ব্যক্তির স্বাভাবিক ব্যবহারটি চরিত্রসম্মত। যেমন মূলত ভাল মানুষ, সৎ মানুষ একটি সাময়িক প্রলোভনে পড়ে কোনও অন্যায় কাজ করলেন। এই দৃষ্টান্তটি একটি কৃত্রিম ব্যবহারকেই নির্দিষ্ট করছে। ব্যক্তি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আড়াল করে সাময়িক প্রাপ্তি বা লাভালাভকেই বড় করে তুলেছেন। এর ফলে ব্যক্তি যে কৃত্রিমতার জালে জড়িয়ে পড়লেন তার থেকে নিষ্ক্রমণ কষ্টসাধ্য। ব্যক্তিকে এখন যথেষ্ট মাত্রায় শ্রম ও ধ্যানের দ্বারা নিজ অভীপ্সায় ফিরে আসতে হবে।

সাধনপথ ও সাধনলক্ষ্য নির্বাচনটি দীর্ঘমেয়াদী। তাই ব্যক্তির চরিত্র সম্মত ব্যবহারের পথেই এটির আবিষ্কার জরুরী। সংস্কার পর্যালোচনা করলেও এর অনেকগুলি মাত্রা পাওয়া যায়। অবশ্য বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। আমাদের দায়িত্ব সংস্কারের মূল প্রবণতা ও চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য বুঝে নেওয়া এবং তার ভিত্তিতেই নির্বাচন পর্বটি সেরে ফেলা।

এতক্ষণ যে সব পদ্ধতির কথা আলোচনা হল এগুলি যুক্তিগ্রাহ্য পথ। যুক্তির ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া বুঝে নেওয়ার জন্য যেসঠিক নির্বাচনটি যাতে ব্যক্তির সংস্কার, রুচি ও চরিত্র সম্মত হয়। এরকমই সব সময় হতে হবে তা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিটি উপযোগী — কিন্তু সবক্ষেত্রেই নয়। নির্বাচনটি স্বতঃস্ফূর্তও হতে পারে। ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রজ্ঞা বা ভিতরে গুপ্ত ভক্তিধনের জাগরণের ফলে মুহূর্তে নির্বাচন হয়ে যায়। একেবারেই স্বতন্ত্র ধারার, স্বতন্ত্র পরিমাপের জীবনের মধ্যে থেকেও অকস্মাৎ মানসপটে নির্দিষ্ট হয়ে যেতে পারে ব্যক্তির অধ্যাত্ম অভীপ্সার পথ। সেই পথে যে পথে অগ্রসর হয়ে ব্যক্তি তাঁর সনাতনী

প্রজ্ঞার জাগরণ ঘটাবেন অথবা সুপ্ত ভক্তিস্রোতকে বেগবতী করে তুলবেন। এই অকস্মাৎ বা স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ ব্যক্তির উপর ভাগবতী কৃপার নির্দিষ্ট পরশ।

নির্বাচনের পদ্ধতি যাই হোক না কেন, নির্বাচন পর্বের পরই শুরু হয়ে যায় মনন পর্ব।

সাধনার দ্বিতীয় পর্ব ঃ মনন ঃ যিনি ভগবানকেই জীবনে চান, ব্রহ্মলাভ করতে উদ্‌গ্রীব, ভগবৎ সেবায় তৎপর তার পক্ষে মনন পর্বটি জরুরী। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ — যে মার্গই অবলম্বন করা হোক না কেন মনন জরুরী। অনেকে বলেন সাধনা পর্বটি যুদ্ধ, সাধন সমর। কেউ কেউ বলেন এটি কৃপার ক্রমঅবতরণ, কেউ বলেন এটি সুপ্ত চৈতন্যশক্তির সুযুম্নাপথে উত্থান ও গতিময় হয়ে সহস্রার অভিসারী হওয়া। আবার কেউবা বলেন এটি নিত্য সেবক হয়ে যাওয়ার এক স্বর্গীয় আবহ। সাধন পর্বে যুদ্ধ অনিবার্য। উপনিষৎ একটি অনন্য উপায় ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

ধনুঃ গৃহীত্বা ঔপনিষদম্ মহাস্ত্রম্
শরম্ হি উপাসানিশিতম্ সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তৎ-ভাব-গতেন চেতসা
লক্ষ্যম্ তৎ এব অক্ষরম্ সোম্য বিদ্ধি।। (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২/২/৩)

[উপনিষদস্নাত মহামন্ত্রকে মহাস্ত্র করে সতত মননের দ্বারা তীক্ষ্ণ বান সন্ধান করতে হবে। চেতনাকে তাঁর ভাবমুখী করে সেই অক্ষর ব্রহ্মতে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে যেতে হবে।]

এর পরেই উপনিষৎ আবার মননের উপর জোর দিয়ে বলছেন ঃ

প্রণবঃ ধনুঃ শরঃ হি আত্মা ব্রহ্ম তৎ-লক্ষ্যম্ উচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম্ শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ।। (মুণ্ডকোপনিষদ্ ২/২/৪)

[ওঙ্কারই ধনু, আত্মাই শর, ব্রহ্ম এই শরের লক্ষ্য বস্তু। অপ্রমত্ত মনের একনিষ্ঠ অনুধ্যানই তাঁর স্পর্শ পেতে পারে]

মননই সেই অস্ত্র যার একনিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধির সঞ্চার হয়। এটি সংগ্রাম এই অর্থে যে মননের সন্নিবেশ ব্যক্তির পক্ষে একটি তীব্র সংগ্রামের পর্ব।এই সংগ্রামটি ব্যক্তির অন্তর জগৎ ও বাইরের জগৎ উভয়েরই সঙ্গে। সংগ্রামটির প্রতিটি পর্বে ব্যক্তির সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ ক্রিয়া করে। ‘লক্ষ্য স্থির হয়েছে’ — এই ঘোষণার দ্বারা বোঝা যায় না যে প্রকৃতই লক্ষ্যটি নির্দিষ্ট হয়েছে কিনা। লক্ষ্য নির্দিষ্ট হলে ব্যক্তির অধ্যাত্ম জাগরণ পর্বও শুরু হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। যে একাগ্রতা লক্ষ্য স্থির করবার জন্য প্রয়োজন সেটির জন্য চাই দীর্ঘ প্রস্তুতি। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ একাগ্রতা প্রসঙ্গে উপযুক্ত উদাহরণ। লক্ষ্যভেদে প্রয়োজন তন্ময়তা। এটিকেই শরবৎ তন্ময়তা বলা হয়। দৃষ্টি লক্ষ্যের প্রতি এমনভাবে নিবদ্ধ থাকবে যে অন্যত্র কোথাও কোনভাবেই দৃষ্টি নিক্ষেপিত হবে না। ব্রহ্মকেই যিনি জীবনের লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন তাঁকে ব্রহ্মভাবেই তন্ময় হয়ে উঠতে হবে। নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা মনের বাতাবরণে আনবে পরিবর্তন। মনের স্বাভাবিক জড়ত্বকে কাটিয়ে উঠে মন ক্রমশঃই চৈতন্য দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠবে। মনের ভূমিতে প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় নিবদ্ধ হবেন সাধক। ক্রমশঃ মনটি এখন ব্রহ্মজারণ ও ব্রহ্মচারণে পটু হয়ে উঠবে। ব্রহ্মভাবকে মন শুধু প্রশ্রয় দেবে না, নিয়ত তাঁকেই আশ্রয় করে মন বেড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে। এটিই মনের মনন পর্ব।

এই মনন পর্বেই সাধকের দৃষ্টিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মই সত্য এবং একমাত্র সত্য হয়ে উঠবেন। মননের দীপ্তিতে এবং মননের তীক্ষ্ণতায় মন এখন অন্য কিছুর প্রত্যাশী হবে না। মন এখন ব্রহ্মমুখী, ভগবৎমুখী। ‘ভক্তি রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তৃণ....’ মন এখন সংগ্রামে নিয়োজিত। মনন প্রক্রিয়ার এই সংগ্রামটির শেষ সমগ্রতায়। সংগ্রাম দিয়ে শুরু হয়ে সংগ্রামেই শেষ নয়। যুদ্ধ ছিল, যুদ্ধ আছে. নিজের জড় প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ; অন্যান্য বিপরীতমুখী প্রবণতা ও প্রভাবের সঙ্গে যুদ্ধ; মনের দিব্যাংশের সঙ্গে জড়াংশের যুদ্ধ। কিন্তু পরিণাম যুদ্ধেই নয়; পরিণাম সামঞ্জস্যে — যেখানে জ্ঞান, ভক্তি, একাকার হয়ে যায়। মননের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতায় আর মার্গের তফাতটি থাকে না। তখন সব মার্গ তাঁতেই লীন হয়। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ হাত ধরাধরি করে এগিয়ে পড়ে ব্রহ্মান্বেষণে, ভগবৎলাভে। মননকে জাগিয়ে রাখবার জন্য, তীব্র, তীক্ষ্ণ করে তুলতেই প্রয়োজন হয় কোন না কোন মার্গের। যে মার্গ দিয়েই আমরা অগ্রসর হই না কেন, পরিশেষে মননই মার্গের রথ হয়ে দেখা দেয়। মার্গের রথটি মনন প্রক্রিয়ার সূচনা করেই ক্ষান্ত হয় না,

মননকে ক্রমশঃই গাঢ়ত্ব ও ঘনত্ব দান করে। মনন নিবিড় হয়ে ওঠে। মনের বাহ্যিক সব বৃত্তিরোধকের পরও মনন থাকে।

মনন যেমন ব্যক্তি নির্ভর তেমনই বহুক্ষেত্রে পরিবেশ নির্ভর হয়ে ওঠে। ব্যক্তির ভিতরকার পরিবেশ এবং বাহ্যিক পরিবেশ উভয়ই মনন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কি ভাবছি, কি করছি, কি বলছি, কোথায় আছি, কেমন আছি, আর সকলেরই বা কেমন অবস্থা—এসবই মনের বাহ্যিক স্তরগুলিতে ফুটে ওঠে, আলোড়িত হয়। মনন প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তির অধ্যাত্মদ্বার ক্রমে উন্মোচিত হয়। মনন যেন ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। মননের সিঁড়ি বেয়েই গড়ে ওঠে তাঁর সঙ্গে যোগ। ক্রমে যোগটি অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়। ভক্ত তখন শুধু তাঁর ইষ্ট দর্শন করেন, আর ইষ্টের সেবায় তৎপর হন। জ্ঞানী তখন ব্রহ্মের প্রজ্ঞাভাস্বর রূপে জ্ঞানস্নান করেন আর যোগী পরব্রহ্মের ভাবে লীন হয়ে থাকেন। মনন এই যাত্রাপথকে করে তোলে দৃঢ় ও মসৃণ।

সাধনার তৃতীয় পর্ব ঃ অনুরাগ ঃ মনন থেকে অনুরাগ জন্মে। এখন আর অন্য কিছুর প্রতি মনোনিবেশ থাকে না। মনের মূল অভিনিবেশ চলে যায় ইষ্ট বা ব্রহ্মের প্রতি। মন এখন ব্রহ্মরস বা ভাগবৎরসে জারিত হতে চায়। মন ক্রমে ইষ্ট, ভগবান বা ব্রহ্ম চিত্তে তদ্‌গত হতে থাকে। মনের মধ্যেই উদয় হয় নতুন ভাব ও নতুন দ্যোতনা। মন এখন তাঁর প্রতি ক্রমে আরও বেশিমাত্রায় অনুরক্ত হয়ে ওঠে। সাধকের এখন অনুরাগের অবস্থা। সাধক এখন তাঁর কথায়, তাঁর নামে, তাঁর ভাবে শিহরিত হন। এখন ভাবে, রসে, জ্ঞানে, ধ্যানে সাধক শুধু তাঁরই অভিমুখী হয়ে ওঠে। অনুরাগ পর্বটি অতি গোপন। নিবিড় সান্নিধ্যে ব্যক্তি এখন তাঁকেই পেতে চায়। অনুরাগের রঙে রাঙিয়ে ওঠে ব্যক্তির তনু, মন, প্রাণ। এখন তিনি অনুরাগের প্রাবল্যে আন্দোলিত হ'তে পারেন অথবা শান্ত তন্ময় হয়ে তাঁর ভাবেই তদ্‌গত হয়ে থাকতে পারেন।

অনুরাগ প্রকাশে আসতেও পারে আবার নাও পারে। অনুরাগের চনমনে প্রকাশেই হয় ক্রমশ বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি। যেমন দাস্যভাব, যা হনুমানজীর ভাব হিসাবে খ্যাত। যেমন বাৎসল্য ভাব—যা মা যশোদার কৃষ্ণ বাৎসল্যে মূর্ত। যেমন মধুর ভাব—যেটি বৃন্দাবনের মূল ভাব। অনুরাগ ভাবের পাদভূমি। অনুরাগ থেকেই একেকটি ভাবের মূর্চ্ছনা শুরু হয়। ভক্তের হৃদয়ে অনুরাগের জন্ম হলে তো আর কথাই নেই। এখন ভক্তির স্রোতোধারা ভক্তকে বয়ে নিয়ে চলে যাবে ভক্তির গহন সমুদ্রে সেই স্রোতোধারা যেখানে আছে শুধুই তাঁর পানে এগিয়ে চলা। এখন শয়নে, স্বপনে, কর্মে, জাগরণে শুধু তারই ভাবরসে ডুবে থাকা। তাঁর ভাবসমুদ্রের অবগাহনের প্রস্তুতি এই অনুরাগেই শুরু হয়। অনুরাগ হলে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দূরে সরে যায়। অনুরাগ বিচ্ছেদের বীজকেও যেন নষ্ট করে দেয়। এখন শুধু তাঁর মাহাত্ম্যে ডুবে থাকা। তাঁর অবস্থা ও অবস্থান ভাবনা নিয়েই সাধক সবসময়ে ব্যস্ত এবং ভাবনিমজ্জিত থাকেন।

জ্ঞানীর শুষ্ক হৃদয়। জ্ঞানীর মত যোগীরাও। জ্ঞানী বা যোগীর অনুরাগ কেমনে হবে? অনুরাগ শুধুমাত্র ভাবে আন্দোলিত হওয়া নয়। জ্ঞানী বা যোগীর অনুরাগ হোল হৃদয়কন্দরে তাঁকে লালন ও ক্রমে তাঁরই প্রতিচ্ছবি অন্তরে অন্তরে সদ্যপ্রত্যক্ষ করা। জ্ঞানী জানেন ব্রহ্ম স্বয়ং আত্মারূপে এই অস্তিত্বের মধ্যে বিরাজিত, তিনি স্বয়ং সবকিছুই হয়েছেন। তিনিই স্থান, কাল, পাত্র। তিনি বৃহতে, আবার সেই তিনিই ক্ষুদ্রে। অণুতে তিনি যেমন রয়েছেন পূর্ণমাত্রায়, তেমনি রয়েছেন মহতে, বরিষ্ঠে, ব্যাপকতায়। তাঁর সান্নিধ্যেই আমরা সতত রয়েছি। এমন কোন ক্ষণ নেই যখন তাঁর সান্নিধ্য হয় না, এমন কোন স্থান নেই যেখানে তাঁর সান্নিধ্য মেলে না, এমন কোন অবস্থাও নেই যখন তাঁর সান্নিধ্য বঞ্চিত হতে হবে। ব্যক্তির উপলব্ধির আলোয় যখন তিনি ধরা দেন, তখনই তাঁর ভাবসান্নিধ্যে চলে আসেন ব্যক্তি। জ্ঞানী বা যোগীর উপলব্ধির সোপান যখনই শুরু হয়, তখনই এক অনাবিল অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হতে থাকে অনুরাগের স্রোত। অনুরাগ পর্বটি স্থায়িত্ব নির্ভর করে উপলব্ধির সারল্য ও গাঢ়তার উপর। উপলব্ধি যতই গাঢ় হতে শুরু করে ততই অনুরাগের অগ্নি যেন প্রখরতর, তীব্রতর, উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। অনুরাগই এখন হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় ব্যক্তিকে তাঁর উদ্দিষ্ট সাধনপথে। অনুরাগটি যেন প্রাণবন্ত একটি শক্তি হিসেবেই কাজ করে, ব্যক্তিকে তাঁর উদ্দিষ্ট সাধন পথে আরও বেশি মাত্রায় এগিয়ে পড়ার প্রেরণাটি আনে। যেন তাঁকে না ভেবে আর একটি ক্ষণও চলছে না। এই, একটু সময় মিলেছে কাজের ফাঁকে, এখনই তাঁকে না ভেবে আর একটি ক্ষণও চলছে না। এই, একটু সময় মিলেছে কাজের ফাঁকে, এখনই তাঁকে ডাকি — যেন তাঁকে না ডাকলে সবই পণ্ড। তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রয়াস। সেই তিনি নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্বিশেষ হিসেবে যেন রূপহীন অস্তিত্ব হয়ে জ্ঞানীর নিকট তত্ত্বত ধরা দিচ্ছেন। অথবা যোগীর সমাহিত চিত্ত অবস্থায় তিনি যোগস্নাতরূপে ভাস্বর হয়ে উঠছেন।

অনুরাগের আকুতি, আবেগ ও প্রকাশ এখন ভিন্নতর। ভক্তের ক্ষেত্রে যেমনটি ছিল, এখানে তা নয়। অনুরাগ এখন বহুবিধ। প্রথমতঃ মার্গের সাধনধারার গভীরতম অংশে প্রবেশের তীব্র আকর্ষণ এখন ফুটে ওঠে। অনুরাগের পরশ সেখানেও লাগে। ফলে সাধক এখন তাঁর সাধনায় নিমজ্জিত থাকার ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা দেখান না। তিনি সাধন সাগরেই যেন ঝাঁপ দেন। সাধন সাগরের গভীর, গোপন তলদেশের প্রতি এক মূর্ত ও অনন্য আকর্ষণে সাধক ছুটে চলেন। সাধকের এখন অনন্যোপায় অবস্থা। ব্রহ্মভাবনা, ব্রহ্মসাধনা ছাড়া তিনি আর কীই বা করবেন? তাঁর করণীয় আর কী বা রয়েছে। তিনি যেন যন্ত্রচালিতের মতই ধ্যানে, সাধনে, ডুবে যান। সাধক এখন জীবনের অন্য সব অঙ্গনের তাৎপর্য খুঁজে পান শুধুমাত্র তাঁর সাধনে। এক তীব্র টান যেন সাধককে টেনে নিয়ে চলে ব্রহ্মভাবের সন্নিকটে। সাধকের ভিতরে চৈতন্য শক্তি এখন সাধন সমন্বয়ে ব্রতী।

সাধন সমরটি ছিল শুরুতে। প্রবৃত্তি , স্বভাব, চারিত্রিক গুণাবলী, আন্তর ও বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম দিয়েই যাত্রার শুরু। এখন অনুরাগের আবেশে সংগ্রামটি রূপান্তরিত হয়ে ওঠে সাধন সমন্বয়ে। তাঁর প্রতি পরম অনুরাগেই তার দিকে মুখ ফেরান, তাঁকে একমাত্র করে তোলা, ধ্যানে, জ্ঞানে। ব্রহ্মের শাশ্বত অস্তিত্ব এখন সাধককে যেন শুধুমাত্র আচ্ছন্ন করে রেখেছেন তাই নয়, যেন অধিকার করেছেন। সাধক এখন ব্রহ্মমুখী। জগৎ আলাদা করে সাধকের চৈতন্যে বৃত নয়, ব্রহ্মের অস্তিত্ব রয়েছে বলেই জগৎ সাধকের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য। তিনি সব হয়েছেন, সবেরই মধ্যে রয়েছেন, তাই তাঁর প্রতি অনন্য অনুরাগবশতই সাধক এখন শুধুমাত্র তাঁরই ধ্যানে সদা নিয়োজিত। সাধক এখন সমপর্ণের জন্য প্রস্তুত।

সাধনার চতুর্থ পর্ব ঃ সমর্পণ ঃ অনুরাগের গাঢ়তায় সাধক এখন আত্মবিলোপ ও আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। সমর্পণেই সাধনার পরিণতি। সমর্পণের আহ্বান জানিয়ে অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবৎগীতায় বলেছেন ঃ

যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মৎ-অর্পণম্।। (শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা, ৯/২৭)

[হে কুন্তিপুত্র, যা কিছু কর্ম কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু যজ্ঞাদি কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর, সে সবই আমাকে অর্পণ করেই করবে।]

সমর্পণের প্রয়াস ও উদ্যোগের প্রেক্ষিত হল ভক্তি। অনুরাগ গাঢ় হলেই ভক্তি বা জ্ঞানও গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তিই এ পথের সার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শনের পরই অর্জুনকে বলেছিলেন যে বিশ্বরূপ অর্জুন দেখলেন তা দেবতাদেরও দুর্লভ দর্শন। বেদাদি শাস্ত্র চর্যার দ্বারা বা পূজাদি কর্মের দ্বারা এই রূপদর্শন সম্ভব নয়। এটি ভক্তির ধন। অনন্যাভক্তির অধিগম্য বিশ্বরূপ দর্শন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ অহম্ এবং বিধঃ অর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।। (শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা, ১১/৫৪)

[হে অর্জুন, আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন, আমাতে একীভূত হতে ও তত্ত্বত আমাকে জানতে হলে অনন্যাভক্তির প্রয়োজন।]

অনন্যাভক্তির দ্বারাই ভগবানের উপলব্ধি লাভ, তাঁকে দর্শন ও লাভ করা যায়। অনন্যাভক্তি থেকেই ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। অনন্যাভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের পথ। শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা ভক্তির ও জ্ঞানের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভক্তির সোপানেই আসে সমর্পণ। তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিই কর্ণে প্রবেশ করে আর কোন ধ্বনিই শ্রবণে আসে না। এখন চোখ শুধু তাঁকেই দেখে, কান শুধু তাঁরই কথা শোনে, বাক্ শুধু তাঁর কথাই বলে। সমস্ত তনু, মন প্রাণ নিয়েই সাধক তাঁর কাছে ছুটে চলেন সমর্পণের আত্মহারা দুর্বার গতিতে। উজাড় করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান। সাধক এখন বিলীন হয়ে যেতে চান ব্রহ্মসমুদ্রে। ভক্তি নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে মেলে ধরেন তাঁর ইষ্টের সেবায়, ইষ্টের তৃপ্তিমানসে। ভক্ত তাঁর আকারটির অস্তিত্ব বজায় রাখেন শুধুমাত্র তাঁর সেবার জন্য। ভক্তের মেলে দেওয়া সেবার ডালি তাঁর পরম প্রিয়। তাই তিনি আহ্বান ধ্বনি দিয়ে ভক্তকে আকর্ষণ করেন। ভাগবত এরকমই বর্ণনা দিয়েছেন রাসলীলার সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির আহ্বানে গোপীজনের ছুটে যাওয়াকে। বাঁশী বাজছে যেন গোপীদের হৃদয়কন্দরে, আর সেই আহ্বানেই গোপী ছুটে চলেছেন কৃষ্ণের অভিমুখে।

নিশম্য গীতং তৎ অনঙ্গবর্দ্ধনম্
ব্রজাস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুঃ অন্যোন্যং অলক্ষিত-উদমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।। (ভাগবত ১০/২৯/৪)

[শিহরণ জাগানো বংশীগীত শুনে ব্রজবাসিনীগণ পরস্পরের অলক্ষ্যেই উদ্দাম গতিতে, আন্দোলিত আভরণ শরীরে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন।]

ব্রজগোপীরা এখন দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। এঁদের দেহ বোধ উধাও। উবে গেছে সমাজ, সংসার আর বৃহত্তর জগৎ। এঁরা শুধুমাত্র কৃষ্ণকেই জানেন ও মানেন। তাই কৃষ্ণ মিলনই এঁদের প্রথম কাজ। কৃষ্ণমিলনে যে কৃষ্ণসেবা সম্ভব হবে একমাত্র সেই বোধটিই জাগ্রত চেতনায় রয়েছে। গোপীজনদের কৃষ্ণভাব সার এঁদের জীবনে। কৃষ্ণতৃপ্তিই এঁদের একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য। কৃষ্ণের জন্যই এঁরা সকলে সমর্পিত প্রাণ। কৃষ্ণের তৃপ্তি ও স্ফূর্তি এঁদের সর্বোত্তম সম্পদ ও আনন্দ। কৃষ্ণসেবায় এভাবে তৎপর গোপীজন স্ব স্ব জীবনের কোনও আঙিনাতেই দায়বদ্ধ নন। এঁরা সমর্পিত প্রাণ। কৃষ্ণের সুখের জন্য এঁরা নিজেদেরকে করেছেন পূর্ণ সমর্পণ। এই সমর্পণই তাঁদের সাধন-নিবেদন। সমর্পণের পথেই এঁদের অন্তিম সিদ্ধি। গোপীদের অন্তিম সিদ্ধি কৃষ্ণপ্রাপ্তি; কৃষ্ণপরিষেবা এবং কৃষ্ণপরিষেবা এবং কৃষ্ণবিলাস। এই প্রাপ্তির কোথাও নিজ অহংজাত কামনার ঠাঁই নেই। তাই গোপীদের সাধন পর্বটি কামনাবিহীন পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। এটি সমর্পণের পরিণতি। ভক্তের পক্ষে যেমন সমর্পণ জরুরী, তেমনি জ্ঞানীর পক্ষেও। ভক্তের কাছে সমর্পণের পাত্র রূপধারী ভগবান। গোপীজনমনবল্লভ কৃষ্ণসুন্দরের কাছে গোপীগণ সমর্পিত। ব্রজগোপীরা নিরন্তর কৃষ্ণধ্যানেই রত। কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞানই এঁদের সর্বস্ব। 'কানু বিনা গীত নাই'—কৃষ্ণ বিনা গোপীদের নেই আর কোন ভালবাসার পাত্র, সমর্পণের ক্ষেত্র। তাই তাঁরা সব পরিত্যাগ করেই ছুটে চলেছেন। কোন গোপী ব্যস্ত ছিলেন রান্নার কাজে, ঘর-গৃহস্থলীর কাজে। কৃষ্ণের বাঁশী শুনেই ছুটলেন। যে কাজটি যে অবস্থায় ছিল সেটিকে সে অবস্থায়ই রেখে ছুটলেন, রান্নার খুন্তি হাতে ছুটেছেন গোপী। কোন গোপী শিশুকে খাওয়াচ্ছিলে, ছুটলেন সেই অবস্থাতেই। কেউবা স্বামীসেবায় ব্যস্ত ছিলেন। কৃষ্ণের বাঁশীর ডাক কোন কাজ বা অবস্থায় গোপীদের সংযত করতে পারেনি। এঁরা সকলেই ছুটেছেন বংশীধ্বনি অনুসরণ করে কৃষ্ণপানে। আত্মহারা প্রেমে গোপীরা ছুটেছেন কৃষ্ণবহ্নিতে নিজ সত্তার সমর্পণ মানসে।

ভক্তের এই সুবিধাটি রয়েছে। ভগবান বিগ্রহবান হয়ে তাঁর সঙ্গে লীলার্থী। তিনি স্বয়ংই আহ্বানটি করছেন। জ্ঞানীর পক্ষে আহ্বানটি একটি অনাহত ডাক। জ্ঞানী তাঁর হৃদয়কন্দরের অতলগহ্বরে তাঁকে দেখেন। দেখেন সেই নিবাত-নিস্কম্প দীপশিখা হৃদয়গুহার ঘনান্ধকারকে দীপ্ত আলোয় করেছেন উদ্ভাসিত। জ্ঞানীর দিক বিচার, বস্থা বা অবস্থান বিচার চলে যায়। তিনি এখন এই দীপশিখার আলো ও অগ্নিতে হতে চান নিবেদিত। জ্ঞানীর প্রজ্ঞা ভাস্বর সত্তাটি এখন শুধু পরব্রহ্মের ভাবধ্যানে নিরত রয়েছেন। গভীর ধ্যান নিমগ্ন জ্ঞানী তাঁর প্রজ্ঞায়, চৈতন্যদীপ্তিই তাঁরই সাহচর্য করে চলেছেন। জ্ঞানীর জগৎটি এখন ঐ সচ্চিদানন্দাশ্রয়ী হৃদয় গুহাটি, যেখানে স্বয়ং তিনি স্বনির্বাচিত একটি অনবদ্য গীতি সুষমায় বিধৃত। জ্ঞানীর বাহ্য চৈতন্য এখন লুপ্ত, তিনি সমর্পণ যজ্ঞে সমাহিত। জ্ঞানের দীপ্তিতে জ্ঞানী বুঝেছেন সচ্চিদানন্দই সব হয়েছেন। তিনি সবই হয়েও আবার সবকিছুরই অগম্য রয়ে গেছেন। তাঁকে জানতে হলে, চিনতে হলে তাঁর দাপ্তিতেই করতে হয়। তাঁকে তাঁর আলোয় দেখতে হয়। সেজন্যই চাই ষট্চক্রভেদ, চাই সাধনার প্রখরতা, চাই অনুরাগের গাঢ়তা। তাঁর দীপ্তিকে চিনে নেওয়া, বুঝে নেওয়ার জন্য চাই তাঁর উপলব্ধির ফল্গুধারা। উপনিষদ বলছেন ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।। (মুণ্ডকোপনিষদ্, ২/২/১০)

[সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। তারকারাজি ও চন্দ্রের দীপ্তিও তাঁর কাছে পৌঁছায় না; বিদ্যুৎ তাঁকে বিভাসিত করতে পারে না; ক্ষুদ্র অগ্নিরই সাধ্য কতটুকু! তিনি স্বয়ং দীপ্যমান। তাঁরই দীপ্তিতে আবিশ্ব উদ্ভাসিত হয়।]

জ্ঞানীর প্রশান্ত প্রজ্ঞায় ভাস্বর হয়ে ওঠে ব্রহ্মের প্রকাশরূপ। তিনি হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে তৎপর হন। ব্রহ্মানুভবের দীপ্তিতে জ্ঞানী এখন সচেষ্ট হন তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিসমাপ্তিতে। জ্ঞানী সাধক এখন সমাহিত চিত্তে ব্রহ্ম ভাবে ভরপুর হয়ে রয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এখন সকলই ব্রহ্মময়, তাই মধুময়। আনন্দময় সত্তার আনন্দ বিলাসের তনু হয়ে ওঠে সাধকের অস্তিত্বটি। সাধক এখন পূর্ণ সমাহিত, সমর্পিত। এঁর স্বাতন্ত্র্য এখন লুপ্ত। সাধকের অস্তিত্বটি আকারমাত্র। এঁর আলাদা পরিচয় রয়েছে নামমাত্র। সাধক পূর্ণজ্ঞানে ভাস্বর হয়ে ব্রহ্মে সমর্পিত হয়েছেন। এখন যা কিছু জগৎকর্ম তাঁর রয়েছে সেটি যেন অপ্রয়াসজাত, অনায়াস সম্ভূত। সাধক আর কিছু জানেন না। ব্রহ্মভাবই তাঁর সার। হনুমানজি যেমন বলেছিলেন, বার, তিথি, নক্ষত্র, জানিনা, জানি শুধুই রাম। সাধকের প্রজ্ঞায় আর কিছুই নেই আছেন শুধুই ব্রহ্ম।

বাহ্য প্রকৃতি এবং পরিষেবা সাধককে প্রভাবিত করতে পারে না। বাহ্য প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য যে আন্তর সহযোগ প্রয়োজন সাধক তা দেন না। সহযোগ ততটুকুই আসে সাধকের কাছ থেকে যা ভাগবতী জীবনের অনুগ। সাধক এখন ভাগবতী জীবনে ব্রতী। জড় জগতের কাছে তাঁর কিছুই নেই প্রাপ্তির বা অপ্রাপ্তির। সাধক সব চাওয়া পাওয়ার অতীত এক জীবন যাপন করছেন এখন। যেসব চাওয়া পাওয়া স্বাভাবিক জীবন, সাধক তার থেকেও বহু দূরে অবস্থান করছেন। তাঁর আর কিছু হওয়ারও নেই। তাই হওয়ার জন্যও তাঁর নেই কোন প্রেরণা বা অনুশোচনা। তীব্র যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহেও তাই তাঁর অনন্য ভগবৎ তন্ময়তা বিরাজ করে। তিনি এক অখণ্ড যোগে বৃত। ব্রহ্মজীবনের এটি প্রতিচ্ছবি। সাধক ব্রহ্মময় জীবনের অধিকারী। ব্রহ্মই তাঁকে যেন আবেষ্টন করে সমগ্র ভাবকে করেছেন ব্রহ্মভাবে বিভোর। তাই সাধক এখন সম্পূর্ণ নিবেদিত একটি প্রাণ।

এই অবস্থায় তাঁর ভাবটি এরকম—নিজে কিছুই জানেন না, পারেন না, করেন না। তীব্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে থেকেও তিনি কর্মে লিপ্ত নন। তিনি সবটাই সঁপে দিয়েছেন। তাই সবসময়েই ভগবৎ ইচ্ছার অধীন তিনি। তাঁর ভাল বা মন্দ বলতে যেন কিছুই নেই। তিনি না চান ভাল, না মন্দ। ভাল, মন্দের অতীত তিনি। সবটাই ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা চালিত। সাধকের জীবনে এখন পরম সত্য, পরম জ্ঞান মাখামাখি করে আছে এক অমূর্ত প্রাণ-শরীরে। তিনি নিজে জীবনকে পরিচালনা করেন না, পরিচালিত হন। তাঁর জীবনে, এই বিশ্বভূমিতেই ফুটে ওঠে দিব্য জীবনের দ্যোতনা। সমর্পিত প্রাণ সাধক প্রকৃতই দিব্য জীবনের অধিকারী।

সাধন বৈচিত্র্য ঃ ভক্ত, যোগী বা জ্ঞানীর সাধন পথ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে ফুটে তাঁর নিজস্বতা। সাধন পথ যেমন ব্যক্তির রুচি বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন হয়। তেমনি সাধন লভ্য অভিজ্ঞতাও হয় ভিন্ন। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী প্রত্যেকই নিজ নিজ সাধনমার্গের স্বতন্ত্র ধারায় স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতায় বিধৃত। তাই সাধনজাত উপলব্ধিও বিভিন্ন।

পথ বা ধারা যেটিই হোক না কেন সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে সকলেই একেকটি বিশিষ্টতা এনে দেবে সাধনপর্বে। সাধনের অনুকূল বাতাবরণ এর ফলে তৈরি হবে। ব্যক্তির অন্তর্জগতে জাগরণ ও চৈতন্য প্রবাহ এখন বাইরের জগৎ এবং সমাজকেও প্রভাবিত, পল্লবিত করবে। সব সাধন পথ ও অভিজ্ঞতাই মূল্যবান। সব সাধন পথ ও অভিজ্ঞতারই মিলিত ফসল একটি সাধন ঐতিহ্য বা পরম্পরা। সাধন ঐতিহ্য ও পরম্পরায় বৃত ভাগবতী পরিবেশই সাধন সম্পদকে প্রসারিত করে।

বৈচিত্র্য যেমন সাধকের আন্তরসংস্কার বা প্রকৃতি থেকে আসে অথবা তত্ত্বধারায় আসে, তেমনি আসে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার নিরিখে। সাধন বৈচিত্র্য সাধনার ধারাগুলির মধ্যে সংঘাতের সম্পর্ক আনে না। তেমনি সমগ্রতায় বিধৃত হতে পারে প্রতিটি ধারা। প্রকৃত ভগবৎ অভিজ্ঞতার অধিকারী সাধকের কাছে মার্গের গুরুত্ব থাকে না। এঁর দৃষ্টিতে রয়েছে শুধুই ব্রহ্ম, ভগবান বা ইষ্ট। পথের সমর প্রক্রিয়ার অতীত ইনি। সাধনসিদ্ধি সাধনসমগ্রতার বোধ সকলের জন্যই এনে দেয়। ভাগবতী অভিজ্ঞতার আলোকেই জেনে নিতে হবে সাধন ও সাধ্য একই সত্যেরই দু'টি প্রতিফলন। একই ফলের দু'টি পার্শ্ব। সাধ্য ও সাধনের অবিনাভূত অবস্থায় বৈচিত্র্যের প্রকৃত রূপটি ফুটে ওঠে।

সাধনার এই পথ বৈচিত্র্যসমূহ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অন্য পথও। যার সহজ-সরল-ঐকান্তিক ভালবাসা ও নিবেদন রয়েছে ভগবানের জন্য, তার নিজের উদ্যোগ আর প্রয়োজন হয় না। ভগবান তার নিত্য সাথি।

শ্রী বিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলি ভগবৎ পথে সবাইকে আহ্বান করবে; আর প্রেরণা যুগিয়ে দেবে ভাগবতী ভাব অর্চনার, স্বাভাবিক জীবনে।

—ঃঃ—

ভগবানই সত্যচেতন স্বরূপ

তুলি চ্যাটার্জী

অনির্বচনীয় তিনি মহাশিব ছিলেন, নিজ ধ্যানে মগ্ন। সৃষ্টির আদি হতেই তিনিই একমাত্র হয়ে অবস্থান করে রয়েছেন মহাব্যোম রূপে। যা আত্যন্তিকেই মহাশূন্য যার না আছে কোনো রূপ, না আছে কালের পরিচয়, না আছে কোনো গুণ, না আছে কোনো বিশিষ্টতা। তাই তো তিনিই স্বয়ংই অরূপ। অনির্বচনীয়, মহাকাল, ত্রিগুণাতীত। কিন্তু তারই মধ্যে অবস্থান করে আছে সব রূপ প্রকাশ, এ জগৎ যত প্রকাশ রূপকে অবলোকন করেছে এতকাল পর্যন্ত, যত রূপকে অবলোকন করছে এবং ভবিষ্যৎ ও যতরূপ প্রকাশকে অবলোকন করবে। সে সবই তাঁরই অরূপের মধ্যেই সমাহিত। তিনি স্বয়ং মহাকাল, তিনি সবকালের অতীত, তিনিইআদি সত্য, এবং তিনি একমাত্র সত্য চেতন স্বরূপ, তাঁর কোনো কাল নেই। তিনি কোনো কালের গণ্ডিতে সীমায়িত নন। কিন্তু তিনিই স্বয়ং মহাকাল, তাঁরই নৃত্যে কালের সূচনা, তাঁরই নৃত্যের ছন্দের কালের চলমানতা নির্ভরশীল আবার তাঁরই নৃত্যের ছন্দে কালের সংহার ও বিনাশ হয়ে চলেছে, সদা সর্বদা। এই জন্যেই কাল বিরাজ করে ক্ষণ মাত্রায়। এই মুহূর্ত পর মুহূর্তেই হয়ে যায় অতীত। সূচনা হয় নতুন ক্ষণের আবার সেই ক্ষণ পর মুহূর্তেই চলে যায় মহাকালে গহ্বরে, আর প্রতিটি ক্ষণ সূচিত করে নতুন সম্ভাবনা, নতুন সৃষ্টি এবং পুরাতনের বিনাশ। আসলে এই আবহ হয়ে চলেছে সেই মহাকালের আবর্তের মধ্যেই জীবের প্রকাশ ক্ষণ সেই কালের গহ্বর থেকে জন্ম নেয় আবার কালের নিয়মেই তার স্থান হয় সেই মহাকালের কোলেই রূপের বিনাশ হয়, কারণরূপ কালের নিরিখেই প্রকাশিত পরিচালিত এবং বিনাশযোগ্য, কিন্তু রূপের অন্তরালে স্বয়ং মহাকাল ফিরে ফিরে যান তাঁরই রচিত আবর্তে। কর্মের দ্বারা সূচিত হয় কোন প্রকাশ আবর্তের মধ্যেই পাক খাবে আর কোন কণা মিশে যাবে সেই মহাকালেরই অভন্তেরে। অর্থাৎ কর্মই হয় নির্ধারক। জীবন কর্মের দ্বারাই বিশিষ্টতা গড়ে তোলে চারপাশে। কোনো জীবন কোনো এক মুহূর্তের জন্যও কর্ম বিমুখ হতে পারে না। কিন্তু জীবনের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা ভাবচেতন, নিরূপণ করে জীবনের অভ্যন্তরের বাতাবরণ কে, এই ভাব চেতন মন-এর শক্তি, প্রাণের শক্তি ও হৃদয়ের আকুতিকে এক সুতোয় গেঁথে সূচনা করে জীবনের বাতাবরণ, এই বাতাবরণই নির্ণায়ক হয়ে যায় যে জীবন কী বিচার বোধ গড়ে তুলবে অন্তরে। জীবনের মাঝে সদাসদ বিচার অর্থাৎ কোনটি ভাগবতী আর কোনটি ভাগবতী নয় এই বিচার গড়ে উঠলেই, জীবনের কর্ম পেয়ে যায় এক অন্যন্য মাত্রা। যে যাত্রা কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে, রূপান্তরিত করে ভাগবতী কর্মে। ভাগবতী কর্ম সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে জীবন প্রকাশ জুড়ে যায় স্বয়ং ভাগবতী ইচ্ছার সাথে। যখন ই জগৎ প্রকাশ ভাগবতী চেতনকে স্পর্শ করে সেই ক্ষণেই জগৎ এর এই ক্ষুদ্র প্রকাশ মহাকালের স্রোতের অংশ হয়ে মিশে যায় মহাকালের সাথে এইভাবে সেই বিনাশ যোগ্য ক্ষণটিই আশ্রয় পায় মহাকালের অভ্যন্তরে, কালটি হয়ে যায় অবিনাশী। এই ভাবেই কোনো প্রকাশ যদি জগৎ মাঝে হয়ে উঠতে পারে ভাগবতী ইচ্ছার বাহক এবং ভাগবতী ইচ্ছার পালক, সেই জীবন ভাগবতী জীবনের পরিণত হয়ে কালের আবর্তের মধ্যে থেকে উন্নিত হয়ে মহাকালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় আর নিজ পরিচয়কে (আপেক্ষিক) তুলে হয়ে যায় সেই অনির্বচনীয় পরিচয়ের মধ্যে লীন।

মহাশিব তিনি স্বয়ং ত্রিগুণাতিত, তিনগুণের পার, কোনো গুণ নেই তার, অন্নদামঙ্গলে কাব্যে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে "কোনো গুণ নেই তার কপালে আগুন" অর্থাৎ তাঁর ত্রিনয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গনে যে গীতার পাঠ দিলেন তার মধ্যে একটি বিশেষ অধ্যায় গুণ ত্রয় বিভাগ যোগ, এছাড়াও ভগবান স্বয়ং নিরুপণ করলেন দেবতার বৈশিষ্ট্য আর অসুরের বৈশিষ্ট্য দেবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগে। অথচ মহাশিব স্বয়ংই কোনো গুণের অধিকারী নন। তাঁর কোনো গুণ নেই অথচ জীবের প্রকাশ সম্ভাব্য সমস্ত গুণই তাঁর হতেই সৃষ্টি। গীতায় তিনগুণ অর্থাৎ স্বত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কথা বলা হয়। সত্ত্ব গুণ যা সাধুর বৈশিষ্ট্য, যা ব্যক্তি পরিচয়কে সব ভালো ভালো গুণের সমাহারে করে সম্মৃদ্ধ, যা সমাজের জন্য ভালো, সততা, শ্রদ্ধাশীল, এই সব ভালো গুণ গুলিই স্বত্ত্বগুণী ব্যক্তির মধ্যে প্রকট হয়, কিন্তু ঠাকুর বললেন অষ্টসিদ্ধির একসিদ্ধি থাকলেও তার ভগবান লাভ হয় না। ব্যক্তি যদি এই বোধ থাকে যে সে ভালো অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহলে তা অহং-এর জন্ম দেয়, আর ঠাকুরের কথা অনুযায়ী অহং-এর লেশ মাত্র থাকলেও ঈশ্বর লাভ হয় না। তাই অর্জুন একজন যোদ্ধা হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হলেন কিন্তু ভীষ্ম বা যুধিষ্ঠির সারা জীবন নিজ নিজ সত্য পালন করলেও ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারলেন না। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে

ঋষি বলেছেন 'দ'-'দ'-'দ'। অর্থাৎ দণ্ড, দয়ধ্যম ও দম্যিয়ত, তিনি দেব স্বভাবকে বললেন দমন করতে। আবার রজগুনি সম্পন্ন মানুষ ও জগৎ এর জন্য দুইই ভালো। যার মধ্যে উদ্যম আছে, যার মধ্যে জগৎ পরিচালনার ইচ্ছা এবং প্রেরণা দুই আছে। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ বললেন 'রজগুণ ডবল ডোজ', সেই পরিস্থিতিতে পরাধীন ভারতবর্ষ কে জাগাতে, উদ্বুদ্ধ করতে রজগুণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্বামীজী তা ভগবান লাভের জন্য বলেননি। রজগুণ জীবন পরিচালনায়, জগৎ-এর সব রকম স্থূল চাহিদা মেটাতে এবং জগৎ-এর মধ্যে ভোগবাদের স্ফুরণ ও চাহিদা, নিরিখ্যে বাণিজ্যিক প্রসার ও অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের জন্য, দেশের পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু সেই গুণও ভগবান লাভ করতে সহায়তা করে না। আর যদি তমগুণী ব্যক্তি জগৎ-এর মাঝে থাকেন, তার মধ্যে নিদ্রা, আলস্য, নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা, সংহারক মনভাব গড়ে ওঠে, সেই ব্যক্তি নিজেকেই সাহায্য করতে পারে না জীবন ধারণের জন্য, ভগবান লাভের উদ্দ্যম বা প্রেরণা কোনোটাই। বর্তমান থাকে না তার মধ্যে। তাই তমগুণী ব্যক্তিও ভগবান লাভের জন্য উপযুক্ত নন। তাই জীবনকে যদি কালের নির্ধারিত রূপ, গুণ কে পেরিয়ে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে হয় তবে প্রয়োজন মহাকালীকে যিনি তাঁর খড়্গ নিয়ে ছিন্ন করে দেন কালের বৈশিষ্ট্য তবেই কাল মিলিত হতে পারে মহাকালের সঙ্গে। মহাকালের গহ্বর থেকেই এইগুণের সৃষ্টি কিন্তু তিনি স্বয়ং গুণহীন। তিনগুণের কোনো গুণই নেই তার। তাই তো তিনি ভালো মন্দের তফাৎ বোঝেন না। তিনি প্রতি মুহূর্তেই জীবনকে সুযোগ দেন আরো উন্নত হয়ে ওঠার। তাঁর কাছে সাধু আর অসাধুর ভেদ বড়ই কম। তিনিই তো আদি পিতা ও মাতা, তিনিই সৃষ্টি কর্তা। তিনি ঠিক বোঝেন যে এই ভালো মন্দ সবই আপেক্ষিক, কালোয়িত। আজ যে ভালো তারও মন্দ হতে বেশী সময় লাগে না তার যে মন্দ তারও ভালো হতে দেরী হয় না। তাই তিনি মূল্য দেন শুধুই ভক্তি, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার, যে হৃদয় সত্যি সত্যি ভালোবেসে নিবেদিত হতে পারে, তাঁর চরণে তিনি তাঁকে এক মাত্র কাছে টেনে নেন। তাই তাঁর চরণে স্থান পায় সব কিছু যা আপাত ভালো বা আপাত খারাপ সবই। তিনিই আদি পিতা ও তিনি আদি মাতা। "জগৎ জনন্যৈ, জগৎ এক পিত্রে"। তাঁর কোনো বৈশিষ্ট্য, নেই যার দ্বারা তিনি বিশিষ্ট ভাবে চিহ্নিত হতে পারেন, এই সৃষ্টি সব প্রকাশেরই এক বিশিষ্টতা থাকে কিন্তু তিনি স্বয়ং বৈশিষ্ট্য হীন, তাঁর কোনো বিশেষতা খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু যে প্রকাশ তাঁকে বিশেষ করে জীবনে বরণ করে, কালের যাত্রায় সে জীবন স্বয়ং বৈশিষ্ট্য হীন হয়ে পরে, এই বৈশিষ্ট্য হীন হয়ে পরার মধ্যে থেকে সে জীবন আনন্দের অনুভূতি পায়। সেই আনন্দ স্বয়ং তিনি। যে জীবন একবার সেই ব্রহ্মানন্দের স্বাদ আস্বাদন করেছে সে জীবন সদা সর্বদা যুক্ত হয়ে থাকতে চায় সেই শিবানন্দের সাথে। সেই শিবানন্দের নন্দিত হৃদয়, শিবগুণগান করে চলে প্রতিক্ষণে, সেই জীবন যে রূপ প্রকাশেই অবস্থান করুক না কেন, সেই রূপের বৈশিষ্ট্য আর তার থাকে না, সে শিবচেতন স্বরূপ হয়ে মিলিত হয় সেই মহাকালের নিত্য ছন্দে। সে প্রকাশ মিশে যায় মহাকালের অভ্যন্তরে। হে মহাশিব জীবনের অভ্যন্তরে গড়ে দাও সেই ছন্দ যে ছন্দে জীবন নন্দিত হবে তোমারই মহাছন্দে, উন্নীত করবে তোমার আর তোমারই আনন্দে হয়ে ভরপুর তোমার অভ্যন্তরেই হবে লীন।

নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়। নমঃ শিবায়।

—ঃঃ—

সত্যের পথেই ভগবান লাভ

সায়ক ঘোষাল

ভগবানকে যে সত্যি চাইতে পারে তারই হয় ভগবান লাভ। ভগবানলাভের জন্য একটি ভগবৎ অভিমুখে দৃষ্টি সম্পন্ন মনোভাব থাকা প্রয়োজন যা সর্বদা ভগবানের দিকে আকাঙ্ক্ষা অভীপ্সা আরো বাড়িয়ে তোলে। মানুষের মনোভাব নির্ভর করে দেয় তার যাত্রা পথ। ব্যক্তির মনোভাব যদি সত্যকে নির্ধারণ করার থাকে, সত্যেরই আরাধনা করা হয় তবে সেই সত্যময় সব চেতনা এই জগতে, তিনিই দিয়েছেন গড়ে এই মনের নানা প্রকার। এই মনের প্রকারে আবার তিনিই দিয়েছেন স্বাধীনতা স্বত্তা। তিনিই জুগিয়ে দেন প্রেরণা তার জন্য যে এই স্বাধীন স্বত্তাকেই প্রয়োগ করে ভগবৎ অভীপ্সায় হয়েছে ভরপুর। চেতন শক্তির হোক নিত্য প্রসার এই প্রেরণার উত্থানে, ভগবৎ সঙ্গে তায় এখন হবে পূর্ণ জীবনের জাগরণ। ভগবানকে সে বরণ করে নিয়েছে সেই পারে জীবন মাঝে পূর্ণ সত্যের অঙ্গিকার করতে। পূর্ণ সত্য একটি গোটা বেলের মত— এই বাইরে খোসা, ভিতরের সারবস্তু সবমিলিয়েই পূর্ণ সত্য।

ভগবানকে জানতে পারলে পাওয়া যায় পূর্ণ সত্যের আভাস। পূর্ণ সত্যের একটি একটি অংশ হল জগতের জড় সত্য জীবনের বাহ্য সত্য আর অন্যটি হল—ব্রহ্মপথের উপলব্ধির সত্য। সবটা মিলেই পূর্ণ সত্য। যে ভগবানকে জেনেছে আর ভগবানের ওপর আস্থা বেড়েছে, ভালোবাসায় বিশ্বাসে ভক্তিতে করেছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ তার কাছে পূর্ণ সত্যই সামগ্রী পায় ফুটে নির্যাসে, ভগবান লাভই পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ।”

(বেদ স্নান সত্যার্থীর ব্রহ্মজ্ঞান সাধন বেদ পথে মাতৃশক্তি প্রকাশন, অধ্যাপক (ডঃ) শ্রীরমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৩৮)

সর্বসময় সর্ব ক্ষেত্রে জীবনের তাৎপর্য তার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ হয় না জগতের জীবন প্রবাহের মতো জীবন প্রবাহ সেই ভাবেই এগিয়ে চলে। ভগবানে বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভক্তি জেগে উঠলে জীবনের মোড় ঘুড়ে যায় এবং জীবন পেয়ে যায় তার উদ্দেশ্য। ভগবৎ ভাব অন্তরে পোষণ সদা ঈশ্বর চিন্তা পরিপূর্ণ মন পাই ভগবান বরণ করে নেন। ভগবানের বার্তায় এখন চেতন স্রোত হবে উর্দ্ধ পথে সদাই এই মানব চেতনকেই অঙ্গিকার করেই পূর্ণ সর্তকে জীবনে স্থাপিত করেই চলবে এগিয়ে জীবন প্রবাহ। এই মানব চেতনা সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মচেতন কৃপায়। এই মানব চেতনেই লুকিয়ে রয়েছে স্বয়ং ব্রহ্মচেতন। আর এই মানব চেতনকে ভগবান প্রসাদরূপে দিয়েছেন প্রশান্তিঃ ক্ষণ, মা বিস্তৃত করবে ভগবৎ ভাবকে। জীবন ভগবানকে ভক্তি নিয়ে অন্তরে যে চলেছে এগিয়ে তার পটভূমি স্বয়ং ভগবানই তৈরি করেছেন। একজন প্রকৃত সাধক বা একজন প্রকৃত ভগবৎ অভীলাসি ব্যক্তি সর্ব দিকে সর্ব ক্ষণে তার ভগবানকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে ভগবান সম্পর্কিত কিছু নেই সেখানে থেকে ভক্ত নেই। অন্তরই সব কিছু এই মানব জীবনে। যে অগ্নিকে ভগবান স্বয়ং হয়েছেন প্রজ্বলিত সেইখানেই জেগে ওঠে প্রেরণা সেখান থেকে মানব মন নিজের স্বাধীনতায় নিজের কর্ম বিচার, কর্মের ধরনে, গুণ বিচারে নিজের চরিত্র গঠন করেন। কিন্তু ভগবান সবাইকেই প্রদান করেছে একই অন্তররাজ্য নিবেদনই নির্ভর করে জীবনের পটভূমি। তাই ভগবানের প্রতিনিবেদনই যথেষ্ট নিবেদনেই বিশ্বাস, ভালোবাসা ভক্তি এই তিনটি মিশ্রণ থাকে যার দ্বারা ভক্তের ভগবানের প্রতি যে মাতৃভক্তি প্রকাশ তা ফুটে ওঠে। ভগবানের এই বিরাট রূপ হয়েছে প্রকাশিত জীবন মাঝে এই অগ্নিময় রূপের বরণেই জীবনে হয়েছে নিত্য প্রকাশ। তাঁর এই বরণে জীবন হয়েছে নানা ভাবের প্রকাশ, এই নানা ভাবের আবাহনে এসে জীবনে নবীন ভাব বিচিত্র যা জীবন কে করছে ব্রহ্মানন্দে লিপ্ত। আবার এই ভাব বৈচিত্র কৃপাই শুদ্ধি হয়ে সংহত করেছে জীবনকে। জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি প্রদান করেছে। মহাকাল স্বয়ং হয়েছেন জীবনের রাজা, তিনি গ্রহণ করেছেন ভক্তের নিবেদন। অভিভাবক হয়ে মাতৃরূপা মহাকাল এখন ক্রমশ প্রেরণা জানিয়ে চলেছে ভক্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এইভাবে। যে প্রেরণা সাধন যজ্ঞকে করেছে অগ্নিময়। তাঁই প্রেরণা জীবন এগিয়েছে তাঁর অন্বেষণে। এযেন কখনো শেষ না হওয়ার পথ, এই কখনো শেষ না হওয়ার পথই সত্যের পথ। হ্যাঁ কোনো ভক্তই চাইবে না ব্রহ্মকে জানা শেষ হতে না কোনো সাধক ব্রহ্মকে জানা শেষ করতে পারবে। এই পথটি হচ্ছে এমন একটি আনন্দময় সাধন মঞ্চ পরিপূর্ণ হয়েও পূর্ণতেই স্থিত। এই মনভূমির অবস্থায় সাধন বার্তা বহন করে নিয়ে আসে স্বয়ং দেবতা। তার সাথে সাহায্য করে স্বয়ং প্রকৃতি। ভক্তের এই সাধন মঞ্চে প্রকৃতি দান করেছেন প্রবাহমানতা। এই প্রবাহমানতা জগতের ভোগ অতিক্রম করেই হয়ে পুনঃ পুনঃ নিবেদন ব্রহ্ম জাগরণ তরে।

সত্যকে জেনেই সত্যের হয়ে জীবনযাপন করে, জাগতিক সমস্ত কর্মের সূচনা জীবনের সত্যবোধকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন করাই জীবনের ভাবপথ হয়ে যায়।

“সহস্রশীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো কৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম।।

পরমসত্য পরম পুরুষ রূপে নিজেকে বিধৃত করছেন রয়েছে যার অসংখ্য মস্তক, চক্ষু ও পদ। তিনি নিজেকে ব্যপ্ত করেছেন বিশ্বময় আবার অন্তরে তিনি বিরাজ করছেন অন্তঃস্থলে, হৃদয়ে, নাভিমণ্ডল থেকে দশ অঙ্গুলি প্রমাণ উর্দ্ধে হৃদয়ে। সমগ্র সৃষ্টির সীমাকেই যেন অতিক্রম করে তিনি ওই হৃদয়রাজ্য হয়েছেন অধিষ্ঠিত।”

(বেদস্নান, সত্যার্থীর ব্রহ্মজ্ঞান সাধন বেদপথে, মাতৃশক্তি প্রকাশন, অধ্যাপক (ডঃ) শ্রী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৬)

ভগবানের দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে হয়েছে দিকে দিকে অনন্ত অসীমে এই বিশ্বময় সর্বত্র। সত্যের এই ছন্দে বিশ্বময় ব্যপ্ত হয়েছে তাঁর ভগবৎভাব। সময় মত এগিয়েছে তাঁর এই ভাব তত প্রসারিত হয়েছে তাঁর এই ভাবই জীবনকে সৃষ্টি করেছে এনেছে। তাঁর স্পর্শে এসেছে জীবনে সতের পথের নিত্য বিকাশ। যে অভীপ্সা করেছে সেই পরমব্রহ্মের তারই পটভূমি করেছেন স্বয়ং পরম ব্রহ্মই।

—ঃঃ—

এক

মনোজ বাগ

১)
আনন্দে এক হয়ে আছি।
আমার আনন্দ এক হবার।

যা অজস্র-যা গুনতিতে অনন্ত, অশেষ
সবটাই মিলেমিশে এক হয়ে গেলে যা হয়-
আমি তা-ই হয়ে আছি!

জলে জল, বাতাসে বাতাস, বালিতে বালি
এক শূন্য আকাশ, এক বিশ্ব জামিন
ভিতরে যা, বাইরেও তাই।
কারো দাবীদার কেউ নেই!
আমার আনন্দ এই-ই!

তোমার আনন্দ দেখতে দেখতে
তোমার আনন্দ জানতে জানতেই
তোমার আনন্দই একটু একটু করে আমাতে মিশছিল।
আমার আনন্দও যেই তোমার আনন্দে মিশে গেল—
দেখছি, একটি একটি করে অনেক, অজস্র, অনন্ত এক, একে অন্যতে মিশে আছে।

মিশে আছে আনন্দে
মিলে আছে আনন্দে....

২)
এক অথচ অনন্ত-অনন্ত, অথচ এক।
একাকার হবার অবস্থা হলে দেখি-
তোমার আনন্দ, আমার আনন্দ একে অন্যতে মিশে অনন্যতার স্মারক হয়ে আছে।

আছে সব যে যার মতো, যে যার ভাবে।
আপাতভাবে আছে যে যার মতো।
পরমাত্ম ভাবে যাঁরা আছেন সদাসর্বদাই দেখছেন-
সব একে অন্যতে মিশে একাকার হয়ে আছে।

আমার আনন্দ, তোমার আনন্দ, তার আনন্দ একাকার হয়ে আছে।
তোমার আনন্দ আমার আনন্দে,
আমার আনন্দ তোমার আনন্দে,
তার আনন্দ আমাদের সবার আনন্দে একাকার হয়ে আছে।

৩)
জগতের কঠিন তরল গ্যাসীয় প্লাজমা সব অবস্থার যিনি ধারক বাহক,
সেই তাঁর কথা ভাবছি—
আকারে প্রকারে, নিরাকারে...

এই আকার নিরাকারের ধারণাগুলি সবই
যা পূর্ণ, যা পরম ভাবে সত্য,
সেই তাঁরই প্রতীক।
প্রতীক আঁকড়ে যে যার মতো যুজছি যে রণক্ষেত্রে
এই রণক্ষেত্রেই পরম সেই সাধনক্ষেত্র
যাঁতে এ জীবন নিবেদিত হয়ে আছে।

৪)
যুদ্ধ ভিতরে বাইরে
যুদ্ধ বাইরে ভিতরে
কাটা মুণ্ডগুলি ছিটকে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে
খাড়াগুলি রক্তাক্ত
ক্লান্ত দেহ, দু-বাহু অবশ, দুচোখ ঢুলে আসছে ঘুমে-
জীবন-সাধনা এরমই চলছে
হাজার হাজার বছর।
ঈশ্বর সাধনায় এগুলির সবই অচল।
অচল একটি একটি সংস্কার আঁকড়ে ধরেই তবুও পাথার পার হবে মানব সমাজ!

বিশ্বাস-ভ্রমে জর্জরিত মন আজও খোয়াব দেখছে
অতল দোখজ থেকে টেনে তুলে কেউ তাকে উজিয়ে ধরেছে স্বর্গলোকে।

জ্ঞান চক্ষু মুদিত রেখেই কেউ দেখছে অন্তরলোক।
ভ্রুরুমধ্যে আগুন তখন স্থিধীর হয়ে জ্বলছে।

৫)
ঈশ্বর আমার মুঠোয় ধরা মোয়া!
মুখভর্তি মাখন!
কোঁচড়ের বাহারি ফুল-কী আনন্দ!

ঈশ্বর কেবলি আনন্দই দেন
আর অনন্ত সৌভাগ্যের বরাত।
আর বিনিময়ে পান স্তুতি—পান
পূজা-শ্রদ্ধা-ভক্তি-জনমান্যতা।

ছেলেখেলাগুলিও শিল্পের পর্যায়ে উঠে এলে যেমন হয়
তখন মাদারির ভেলকিও পরম আনন্দের খোরাক হয়
সেই অবস্থাই ঈশ্বরের!

কে কাকে দেখবে-কে কাকে দেখাবে।
লোকে লোকারণ্য চারপাশ-জমে আছে বিন্দু বিন্দু জল—
ঐ জলেই থৈ থৈ করছে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল।

সময় হাসছে মুখ টিপে—
আর ঈশ্বর চেয়ে আছেন তাঁরই কায়া ঐ সময়ের দিকেই

৬)
এত করেও ভিখিরিপনা যাচ্ছে না।
দাও দাও দাও-যাচ্ছে
আদিখ্যেতাগুলি দিনকে দিন বাড়ছে বই কমছে না।

ঈশ্বরের নামে করা বিপণনী কেন্দ্রগুলি যত ফুলে ফেঁপে উঠেছে-
ঈশ্বর-ভজনেওয়ালাদের ধনসম্পত্তিও ততই বেড়েছে।
সাধারণ মানুষ মেধায় তত দূর পর্যন্ত নয় বলেই,
ও সবের খোঁজ কোন কালেই রাখে না।
যদিও যুগে যুগে এর ধকলটা সইছে তারাই।
পরম বিশ্বাসে দানসামগ্রীর যোগান তাদেরই দিতে হয় বলে।

সইতে সইতে সহ্যের সীমা ডিঙিয়েও যারা সইছে,
তারা আবিশ্বের আমজনতা।
তাদের যে যা বলছে আজও তারা তাই-ই শুনে যাচ্ছে
আর অন্য কোন উপায় নেই বলে।
যে যা বলছে করছে আর বিকল্প নেই বলে।
আর পদে পদে জন্মাচ্ছে আর পদে পদে মারছে।
জন্মেই দেখছে চারদিকটা থিক থিক করছে স্বপ্নে।
মরতে মরতে দেখছে আলোর বিকল্প এখানে অন্ধকার।
তবে কেউ কেউ প্রশ্নও করছে—

মানুষের সব প্রসন ঈশ্বরকে ঘিরে।
ঈশ্বর জানেন।
তবে নিজে থেকে যা ইচ্ছে তাই করেন না কিছুই।
কারণ তাতে অনেক অসংগতি থেকে যাবে।
অ্যাণ্ডায় গণ্ডা মেলাতে মেলাতে তাঁর হাড়-মাস কয়লা হয়ে যাবে।

অনেক অনেক দিন পর পর এসে
কেউ কেউ এই কিছু না করার ব্যাখ্যা যতটা সম্ভব দেন।
যদিও মানুষেরা এঁদের থেকে শিক্ষা নেয় না কিছুই।
ঈশ্বরের তগমা দিয়ে তাঁদেরই তুলে রাখে উঁচু তাকে।
আর রোজ নিয়ম করে চারটে ছটা ফুলোৎসর্গ করে ফোকোটে কিছু প্রাপ্তির আশায়।

ছলে বলে কৌশলে আখের বুঝে নেবার দুর্বুদ্ধিটা
তাই আজও মাথা থেকে যাচ্ছে না—
না সাত্ত্বিকের, না রাজসিকের
না তামসিকের।
ফলত তালগোল পাকানো একটা সমাজ ব্যবস্থা আজও অক্ষয় হয়ে আছে।

তবে শেষ পর্যন্ত থাকবে না।

ঝড় আসছে!

(৫)
আমি আছি আর ঈশ্বর।
আর কেউ নেই, কিছু নেই।

মুনডু নেই, ধড় নেই
দেহের হাড় মজ্জা মেদ রক্ত মাংস নেই

জল স্থল স্থাবর অস্থাবর
আমার নিজের বলতে কোন কিছু নেই।

শুধু প্রাণের বোধটকুই আছে মাত্র।

চেয়ে আছি-চেয়ে চেয়ে ঈশ্বরকে দেখছি
আর শুনছি কানে তাঁর নাদ, ধ্বনি, শরুতি
স্পর্শে বুঝচ্ছি তাঁর পরম উপস্থিতি।
আমার অধ্যাত্ম সাধনা, জীবন বোধ এটুকুই।

(৬)
আমাতে কিচ্ছু নেই।
ঈশ্বরে সব আছে।

আমার আমারগুলো দেখি, যা গচ্ছিত আছে ঈশ্বরে।
তোমার তোমারগুলো দেখি, যা রক্ষিত আছে ঈশ্বরে।
তার বা তাদের তাদেরগুলিও দেখি, যা ঈশ্বর জুড়ে আছে।
কী বিরাট একটা ব্যাপার!
ঈশ্বরে সব আছে, নেই বলে কিছু নেই।

ঐ বিরাট থেকে খোলামকুচির মতো
একটা দুটো কিছু সরিয়ে যে গ'চে রাখব নিজের জন্য
তেমন কোন দেরাজও আমার নেই।

যা আছে ঈশ্বরে, ঈশ্বরেই থাক।
আমার কাজ রাজসাক্ষীর—

(৭)
দুঃখ হয়, দুঃখেরও ক্ষয় হয়।
সুখ হয়, সুখেরও লয় হয়।

আনন্দের কিছু হয় না - না ক্ষয়, না লয়।
আনন্দ অবস্থান করে সর্বত্র।
সদাসর্বদাই আনন্দের অবস্থান পরম অবস্থানে, পরম ভাবে।

বিশ্বাস এই আনন্দেরই দ্যুতি।
জ্ঞান এই আনন্দেরই পরম উত্তাপ।
বেদ এই আনন্দেরই রূপ-অরূপ।

অন্তর-বার যেখানে এক নয়,
সেখানে সেখানেই এই বেদ চিরদিনই অধরা।

বাস্তবতাটি যাই হোক-
অধরা বলে জগতে কিছু নেই।

ঈশ্বরেই আছি, ইশ্বরই অনুভব করছি
ঈশ্বরেই চুবে থেকে আমৃত্যু জরে থাকছি ঈশ্বরেই—

এই বোধের আনন্দ আর আনন্দের বোধ
নিয়েই আছি - কে নয়? - সবাই।

দুচোখ বুজে থেকে যারা অন্ধ, তারা মর্ত্যবাসী।
দুকানে আঙুল চেপে যারা বধির,
তাদের অবস্থান পাতলপুরীতে।
যারা মন প্রাণ বিবেক খুইয়ে বাঁচেন তাঁদের বিচরণক্ষেত্র স্বর্গভূমি।

যাদের কোন আগুপিছু নেই তাঁরা আনন্দী।
যারা আনন্দস্বরূপ তাঁদের নিজস্বতা তাঁদের অন্তরের ঐশ্বরিক দ্যুতি।

(৮)
সবার হয়ে আছেন ঈশ্বর।
সব কালের , সব স্থানে, সব পাত্রের হয়ে আছেন...

বিভুর যিনি, তিনি বিন্দুরও।
যিনি ধুলি-ময়লার, তিনি মহার্ঘ্যও।

যে মানুষ ঈশ্বর সাধন করছেন,
তাঁর সাধনাও বার হয়ে ওঠার।

একটি একটি মানুষ, দুটি হাত, দুটি পা, একটা মাথা, একটা ধড়-
হৃদবৃত্তিতে, মনোভাবে-সবার হয়ে উঠছেন, ঈশ্বর ভাবে, ঈশ্বর মননে-

এই সবার হয়ে ওঠার নিরন্তর চেষ্টা যারা করছেন তাঁরা ঈশ্বর সাধক।
যাঁরা ঈশ্বরের পূজারি।
তাঁরা সবাই....
বাকিরা?
বাকিরা?
বাকিরাও-যারা একলাষেঁড়ে-যারা নিজের নিজের ব্যথা-বেদ্না নিয়েই মশগুল-
যারা সমাজে কিচ্ছুটি না, শুধুমাত্র সংখ্যা

তারা নিজেরাও, তাদের কাজকর্মও ঈশ্বরীয়-ঐশ্বরিক অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য নিবেদিত।

এই এদেরই, কেউ কেউ জেনে বুঝে তত্ত্ব ধরে ধরে ।সধন করছেন ঈশ্বরের।

কেউ বা না জেনে বুঝেই ভুলভাল মন্ত্রে, ভুলভাল সংস্কারে ।ধন করছেন ঈশ্বরের।

জগতে জীবনে আর অন্য কিছুই করার নেই বলেই যে যার মতো। করেই ।সধন করছেন ঈশ্বরের।

ঈশ্বর সবই জানেন-তবে কোন ধর্মগত বা তত্ত্বগত ভাবে নয়।

জানেন আত্মস্থ হয়ে, আত্মগত ভাবে।

আত্মস্থ তিনি, জলে জল, বাতাস্সে বাতাস, মাটিতে মাটি....

নিরাশ্রয়, আশ্রয় চেয়ে ফিরছি
নিরাপদ যে কোন একটা ঠাঁই দাও, সময়....
ক্ষুধার্ত, অন্ন চেয়ে ফিরছি

তৃষ্ণায় কাতর আমি, এক অঞ্জলি জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে মরছি আকাশ থেকে জমিন মায় অতল জলের গভীর, সর্বত্র।

আমার স্বর্গ মর্ত্য পাতাল একটাই, যার নাম ধরিত্রী।

ধরিত্রীকে বলছি ধরিত্রী কিছু একটা করো।

আমার নিরাপদ আশ্রয়ে, ক্ষুধার অন্নের, তৃষ্ণার জলের একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা তুমি অন্তত করো-

তুমি না করলে এ সবের ব্যবস্থা আর কে করবে?
আর কে আছে যে এ সবের দায় নেবে।

ধরিত্রী আমার কথা শুনছ না-শুনলে কিছু একটা করতেন, তেমন কিছুই তো করতে দেখছি না।

তিনি আমার কথা বুঝছেনও না, বুঝলে আভাসে ইঙ্গিতেও বোঝাতেন তাঁর সাড়া
কোন না কোন ভঙ্গিতে।

তবু আমি তাঁকেই ডেকে যাচ্ছি বারবার
তাঁকেই নাড়িয়ে নাড়িয়ে জাগাতে চাইছি আরবার
আমার জীবন-বেঁচে থাকা এই তাঁকেই জাগানোর
যেল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

(১০)

ফুটে আছে ব্রহ্মকমল সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে জুড়ে।

তার একটি কেটি পাপড়ি ফুটে আছে।

একটি একটি সৌর-লোক, গ্যালাক্সি, নেবুলা-নেবুলি জুড়ে।

তার স্বর্গীয় সুগন্ধে ভরপুর হয়ে আছে সব দিক।

পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঈমান অগ্নি নৈঋতে বায়ু উর্দ্ধ-অধঃ...

আমার পরম সৌভাগ্য আমি আমার সামান্য দুটি চর্মচক্ষুতেই তার এই ফুটে থাকা অপলক হয়ে দেখছি।

আমার দুটি দেহজ কানেই শুনতে পাচ্ছি তার প্রণব ধ্বনি।

আমার সামান্য একটি ঘ্রাণেন্দ্রিয়েই পাচ্ছি তার দিব্য গন্ধ।

এখন গভীরতর কালরাত্রি নাকি পরম আলোকমণ্ডিত কোন সুদিন।

আলোয় আলো সব।
অন্ধকারে অন্ধকার সব!
হিরণ্ময় অন্তর-বার।

এখন আর দিন ও রাতের কোন আলাদা আলাদা বোধ আমার মধ্যে নেই।

—ঃঃ—

শ্রীঅনির্বাণের আত্মচিন্তা প্রসঙ্গ

আশুরঞ্জন দেবনাথ

পণ্ডিচেরী যাবার প্রস্তুতি চলছে। সে সময়ে নানা কারণে কিছুটা মানসিক বিষণ্ণতায় ভুগছিলাম। খাবার আগে স্মবামীজির চিঠি পেলাম। হৈমবতী নরেন্দ্রপুর থেকে ৩১৩১-১-৬১ তয়ারিখে স্বামীজি লিখেছেন,

একটা হতাশার ভাব এসেছে তোমার মধ্যে—এটা তামসিকতার ফল। কোনে বাসনার উত্তেজনা বা উদ্দীপনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে চিত্তকে যদি প্রসন্ন রাখতে পার, তাহলে এই হতাশা আর অবসাদ কেটে যাবে।

তোমার যা ঘটেছে, তা খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। কিন্তু তুমি তাকে ভুল বুঝছ বলে মনে করছ হায় কিছু হিল না।

আর তা থেকেই আক্ষেপ আক্রোশ ইত্যাদি যত বিড়ম্বনার সৃষ্টি।

আত্মবোধ কেবল মানসিক বোধই নয়—সমস্ত ত্তা দিয়ে বোধ। এমনকি প্রশান্ত নিদ্রার পর একটা সজীব এবং প্রসন্ন চিত্ত নিয়ে জেগে ওঠাটা ওই আত্মবোধেণই অন্তয়র্গত। তখন ঘুমটা অথভা সন্ধ্যার ধ্যানটা বৃথায় যায় না। মন জেগে থাকবে এটা আমরা চাই বলে ঘুমকে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করি। ধ্যানেই হ'ক বা ঘুমেই হ'ক—প্রসান্ত ও প্রসন্ন চিত্ত নিয়ে তাতে তলিয়ে গিয়ে াবার তেমনি প্রসন্নতায় যদি জেগে উঠতে পারি তখন মাঝখানকার ওই অব্যক্ত অবস্থাটা ক্রমে আলোময় হয়ে ওঠে। তখন মন থাকে না, কিন্তু জাগে বোধি। তখন ওই সন্ধ্যা হতে রাত পর্যন্ত যে অব্যক্ত দশায় যাপন তারই পরিণামে দিনের কল্পলোককে আমরা গড়ে তুলতে পারি। এই অবসথাগুলি খুব সহজ হয়ে তোমার মধ্যে আসছে। ওদের যদি তেমনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পার, তাহলে দেখবে, এইভাবে কেটা দিবারাত্রের কাব্য রচনা করবার জন্যই তুমি জগতে এসেছ। পৃথিবীর কাছে তোমার তখন পাবার কিছুই নাই—আছে দেবার, দিচ্ছ তাকে তোমার জাগ্রতের কর্ম, স্বপ্নের স্বর্গলোক, আর সুপ্তির শান্তি। এ-পাওয়া সহর স্থিতি— যা অতি বড় সাধকেরাও সবসময় পায় না।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ

স্বামীজিকে পেয়েছি এবার চারদিন। পণ্ডিচেরী যাওয়ার পথে কেঁয়াতলায় কিছুক্ষণের জন্য, তারপর ফেরার পথে তিনদিন—দু'দিন নরেন্দ্রপুর হৈমবতীতে, একদিন কেঁয়াতলায়।

কেঁয়াতলা—১৬-২-৬৯, রবিবার—ষোঢ়শ দশন।

সেদিনই সকালে হাওড়া পৌছেছি। বিকাল চারটায় স্বামীজির সাথে দেখা করার কথা। হাতে সময় কম। তাই ফোন করে তিনটায় যাবার অনুমতি নিলাম। স্বামীজি শুয়েছিলেন। যেতেই ডেকে দিলেন। স্বামীজি তাঁর ইজি চেয়ারে বসলেন। প্রণাম করে পাশে বসলাম। পণ্ডিচেরীর কথা উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম কি কি দেখার আছে। বললেন, আশ্রম, শ্রীঅরবিন্দের সমাধি আর সমুদ্র—এই তো। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে সাধারণ কিছু কথাবার্তা বলে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। বললাম, স্বামীজি, পণ্ডিচেরী থেকে ফিরব ২৫ তারিখ। সময় পেলে সেদিন দেখা করব। স্বামীজি সময় দিলেন বিকাল চারটায়, নরেন্দ্রপুরে।

হাওড়া থেকে সন্ধ্যায় গাড়ী। তৃতীয় শ্রেণীর সাদারণ কামরা। তখন তো রিজারভেশনের (Reservation) বালাই ছিল না। দু'রাত্রির সুদীর্ঘ পথ।

আশ্রম প্রাঙ্গণে শ্রীঅরবিন্দের সমাধিবেদীর পাশে সকাল-সন্ধ্যায় দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। সেদিন শ্রীঅরবিন্দের ঘরও খোলা ছিল ভক্তদের জন্য। এস গর ঘুরে ফিরে দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে। আশ্রম থেকে দু'পা গেলেই সমুদ্র। তাছাড়া আমাদের থাকার গেষ্ট হাউসও ছিল সমুদ্র পারেই। অরোভিল তখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। আশ্রম সম্পাদক নলিনীদাকে দেখেছি ওনার ছোট্ট ঘরে কর্ম ব্যস্ত। নীরদদাক পেয়েছি। আলাপ হয়েছে "তন্ত্রাভিলাষী সাধুসন্ধ" গ্রন্থের প্রণেতা প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাথে।

***

কেঁয়াতলা, কলকাতা; ১লা মে, শনিবার, ১৯৬৯

উনবিংশ দর্শন

বিকাল চারটায় কেঁয়াতলায় এলাম। স্বামীজি অসুস্থ শুয়ে আছেন। বুকের পাশে অসহ্য যন্ত্রণা; ঠাণ্ডা লেগেছে, কাঁশি। এখন অনেকটা ভাল। যেতেই স্বামীজি উঠে এসে ইজি চেয়ারে বসলেন। প্রণাম করে সামনে বসলাম। খুব একটা কথাবার্তা হয়নি। অধিকাংশ সময় চুপচাপ বসে ছিলাম। স্বামীজির সামনে চুপচাপ বসে থাকাও বড় প্রশান্তির! ক্রমে আরও সব ভক্তেরা এলেন। সন্ধ্যায় ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে অভয় দিলেন ভয়ের কোন কারণ নেই। দু'দিনেই ভাল হয়ে ওঠবেন। সাতটা প্রায় বাজে। দর্শনার্থী ভক্তেরা একে একে বিদায় নিলেন। আমিও প্রণাম করে যাবার জন্য তৈরী হলাম। স্বামীজি সদ্য প্রকাশিত 'পত্রলেখা' এক খণ্ড দিলেন। এবারের পর পর চারদিনের দর্শন পর্ব এখানেই সমাপ্তি। জানি না আবার কতদিনে সে সৌভাগ্য হবে। রাত ন'টায় হাওড়া থেকে গাড়ীতে উঠলাম।

***

হৈমবতী, ৯/৩ সেন্ট্রাল পার্ক; যাদবপুর, কলি-৩২
৯/১১/১৯৬০—রবিবার। — বিংশতি দর্শন।

তোমার চিঠি পেলাম। তুমি আমার বিজয়ার স্নেহাশিস নিও। ৯ই নভেম্বর সাড়ে চারটার সময় এসো—তাহলে ঘণ্টাখানেক সময় দিতে পারব। তোমার সংশয় ও প্রশ্ন নিয়ে তখন খানিকটা আলোচনা করা যাবে।

তবে কিনা সব প্রশ্নের জবাব অন্তরেই পাওয়া যাবে। একই সমস্যার নানা ভূমি তে্কে নানারকম সমাধান হতে পারে। চেতনার ওপরতলার সমাধানগুলি খুব ক্ষিপ্র এবং আশু ফলপ্রদ মনে হয়। কিন্তু সেগুলি শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায়। চিত্ত শুদ্ধ না হলে কোনে মহৎ কাজই সুধু চালাকির দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না।

ধর্মের সঙ্গে প্রেম বা রজনীতির কোনও বিরোধ নাই, থাকতে পরে না। আমরা এতকল ধর্মকে ে দুটির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে রখতে গিয়ে তার ভিত্তিকে দুর্বল করেছি। তাইতে আমাদের ধর্ম জীবনে বীর্য সঞ্চার করেনি। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই এই অবস্থা। চারদিকে কেবল ধোঁয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। এটা হচ্ছে, কেননা ভেজা কাঠে আগুন সেঁধুলে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও আমাদের লক্ষ্য ধোঁয়া নয়, আগুন। আর সে-আগুন আমাদের হৃদয়ের গভীরে। এইজন্য ভগবানকে পেতে প্রেয়সসীকে পেতে দেশকে পেতে আমার নিজের মধ্যেই ডুবতে হবে। অখণ্ড সত্যের রূপকে সেখানেই জানতে পারব।

আজ যাই
অনির্বাণ

বিকেল রসাড়ে চারটা থেকে সাতটা অবধি ছিলাম। এ সুদীর্ঘ সময় স্বামীজি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে আমি একাই ছিলাম। তারপর সন্ধ্যায় আরও দু'ভদ্রলোক এলেন। সেদিন ছিল কালীপূজা, দীপাবলী উৎসব।

আলোচনা শুরু কালীতত্ত্ব দিয়ে। স্বামীজি আলোচনায় যা বললেন চিঠিতেও লিখেছেন, " কালের শক্তি কালী। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন যে লোকসংহারী কালের পরিচয় পাই, তারই শক্তিরূপ কালী। মূল হল চণ্ডীতে — খণ্ড শতীর তৃতীয় চয়রিত্রে। এই চণ্ডীরহ পূজা ও আরাধনা ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই আছে। শক্তির একটা সংহার মূর্তিও আছে — জীবনে, জগতে তা দেখতেই পাচ্ছ। শুধু সুন্দরেরই পূজা করবে, ভীষণের করবে না? বেদে এই কলী 'সিনীবালী' বা মুক্তকেশী, চতুর্দশীর অন্ধকারের দেবতা—যখন জীবনের প্রলয় জগতের প্রলয়? এই কালশক্তি চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত।

আকাশ তত্ত্ব সম্পর্কে বললেন, "আকাশ আর আলো—একই সত্তায় এপিঠ আর ওপিঠ। আকাশ সত্তা, আলো চৈতন্য। সত্তা আপনাতে আপনি থাকা। চৈতন্য তখন অন্তর্মুখ থাকে, আবার বহির্মুখও হতে পারে। যখন বহির্মুখ হয়, তখন আলো ফোটে — জগতের সৃষ্টি হয়। এজন্য আকাশকে বলে শিব, আর আলোকে শক্তি। শিব-শক্তি অভেদ; আকাশ আর আলোও তাই। কেবল কোন সময় আকাশে আলোও থাকে না— কিন্তু তখনও আকাশ থাকে।

আনন্দ দুয়েরেই সহজ ধর্ম— আপনাতে আপনি পাকাতেও যেমন আনন্দ, সৃষ্টিতে তেমনি উপচে পড়াতেও আনন্দ। সব মিলিয়ে সৎ-চিৎ আনন্দ বা ব্রহ্ম।"

তিতিক্ষা, ধ্যান-ধারণা প্রত্যাহার সম্পর্কে বিশদে বললেন যা পরবর্তী চিঠিতেও লিখেছেন, ১২/৪/৭০ তারিখে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে,

নিজেকে চিন্তা করা আত্মচিন্তা। শিব, কালী ইত্যাদি চিন্তা দেবচিন্তা। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইত্যাদির চিন্তা গুরুচিন্তা। দেবতা বা গুরু (মহাপুরুষ) দুই-ই ব্রহ্মচৈতন্যেরই প্রকাশ। আমার চৈতন্যও সেই ব্রহ্মের চৈতন্য। সুতরাং আত্মা দেবতো বা মহাপুরুষ—সবই চৈতন্যস্বরূপ একই ব্রহ্মের ত্রিধা প্রকাশ। কেউ দেবতা চিন্তা করে, কেউ মহাপুরুষের চিন্তা করে। চিন্তা করতে করতে তাঁদের চৈতন্যে আমার চৈতন্য উদ্দীপ্ত হয়। তখন তাঁদের আমি আত্মস্বরূপ বলে অনুভব করি।

কেউ আবার নিজেকে দিয়েই ভাবনা শুরু করে। দেবতা বা মহাপুরুষের ভাবনা পরোক্ষ— তাঁরা আমার বাইরে। কিন্তু আমার আত্মা আমার অপরোক্ষ। আমি যদি নিজেকে জ্যোতি বা আকাশরূপে ভাবনা করি, তাহলে সেই জ্যোতিতে বা আকাশে দেবতাদের বা মহাপুরুষদেরও ফুটতে দেখব। তখন তাঁদের সত্য করে আপন করে পাব।

তাই আত্মচৈতন্যের ভাবনা করাই প্রকৃষ্ট সাধনা; আত্মচৈতন্যের অনুভব নির্ণল হলে দেবতা বা মংহাপুরুষের তত্ত্বজ্ঞানেও কোনও খাদ বা ফাঁকি থাকে না।

মন কেবল বাইরে ছোটে। তাকে বার বার ভিতরে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাকে বলে প্রত্যাহার, কিনা withdrawing within one's self। তখন বাইরের জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। এই প্রত্যাখানকে বলা হয় rejection। দেখ গীতা ৬/২৪-২৭ শ্লোক।

আশা করি ভাল আছ। স্নেহাশিস রইল

অনির্বাণ

আরও লিখেছেন, 'তিতিক্ষা হল অটল থেকে বাইরের সমস্ত আঘাতকে সহ্য করা। এ থেকে বীর্য লাভ হয়, আত্ম প্রত্যয় দৃঢ় হয়।

চিঠিতে যে আলোচনা সংক্ষেপে কতরেছেন তত্রাদ্দরই বিস্তৃত আলোচনা করলেন অনেক সময় নিয়ে। আমরা শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ুনলাম। কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়ে পওহারী বাবার উদ্ধৃতি দিয়ে বলনে, "ধ্যান যতখানি মনোযোগ দিয়ে করবে, ঘটিটিও ঠিক ততখানি মংনোযোগ দিয়ে মাজবে?"

সময় কিভাবে বয়ে গেল বুঝতেও পারিনি। স্বামীজির এই সুদীর্ঘ দিব্য পেয়েছি কথোপকথন সবটাই যে বুঝেছি বা অনুভব করতে। এমন বলব না। যতটুকুই বা বুঝেছি তারই বা কতটুকু মন রাখতে পেরেছি। তাই বড় দুঋখ হয় আজ একজন শ্রীম নেই যিনি স্বামীজির এই অমুল্য কথামৃত ধরে রাখতে পারতেন। পিদেন পক্ষ আমার যদি একটা টেপরেকর্ডারও থাকত। জীব-জগৎ-ব্রহ্ম সম্পর্কে এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর স্বচ্ছ আলোচনা দুর্লভ। সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেল।

স্বামীজি অবশ্য আর কথোপকথনের নোট চাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। শ্রীমতী লিজেল রেঁখ যখন আলমোড়ায় প্রথম স্বামীজির সান্নিধ্যে আসেন তখন একবার চেষ্টা করেছিলেন। স্বামীজি তাকে নিরুৎসাহিত করেন। Madame dixelle Reymond তাঁর "y life with a Brahmin Family" গ্রন্থের "RISHIDA" অধ্যায়ে লিখেছেন,

I listened with all my ears, eager to forget nothing of what he said, trying to remmember every single word, One day, I took notres, but Rishida laughed at me. Why do you want to imprison what I saay and give it form?' he said, 'Everything has already been spoken and written many thousands of times. Nothing can belong to you unless it grows within you during a secret winter of hibernatin. After that, whatever you remember naturally and effortlessly will be yours, but only after tims long testing-time. Light soil catches water and absorbs it.

Baked earth fends of the sun and is carried away or flooded. One day, you will find yourself saying, "I know, I feel, I am." Then it will be true. But you will find nothing of all this in books; truth is written between the lines!'

যাবার সময় হবয়ে এল। স্বামীরা একে একে বিদায় নিলেন। শেষ মুহূর্তে আমি একাই ছিলাম। কিছু ব্যক্তিগত কথাবার্তা হল। স্বামীজি নানা বিষয়ে খোঁজ খবর নিলেন। সাড়ে সাতটা বাজে। প্রণাম করে এবারের মত বিদায় নিলাম।

—o—

Discovering Inner Reality: Look Within

—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee

Lord Krishna continues saying those who have no discipline and lacks in control of the senses and are prone to greed, desire etc. thus goes away from God's spirit.

Asamyata aatmana yogoh dusprapah hi iti mae matih.
Vashya aatmana tu yatata shakyah abyaptum upayatah. (G.6/36)

Willed imagination and the vision of the same in life be equated to the divine spirit in him as a person. Therefore, the feeling that a kind of connection is established in the design of things such that the yogi now may be fortunate to receive the message of divine in some form. The task is to understand and to make out that the usual way of this focus in the spirit is to have it. Now the faith of having that very clearly in the literature for the supreme present within.

Arjuna Ubacha:

Ayatih shraddh aupetoh yogah chalati manasah.
Auprapyam yoga sam siddhim kan gatim krishna gachhati. (G.6/37)

Arjuna was curious to know the real destiny of a person who has deviated from the path of purity and truth. Even if this person does meditation what would be the real outcome of the same.

After giving sufficient time to spend at this stage of willed imagination the person may now focus on the somewhat detailing of the focus of the entire process. With the willed imagination experienced things in the right sense, the carry forward impact of this would entail that the cosmic energy is now connected with and can be invocated in the life to have the impact in the thoughts, acts of life having the spirit elevated to the same. The task now is to directly be tuned to the cosmic energy and getting that aligned for life in its own perspective and the enhanced level of realization.

The devotee now develops a true attraction for the cosmic spirit. Now in a way, this is actually taken care of by the broad view and openness of mind of the devotee. What exactly is now the position of the mind of the aspirant, this mind is now different from the perspective of the world. Thus the cardiac center, deep in the cave of the heart to visualize his presence.

Arjuna had further question in mind that the person who is deviated from the way of divine action and that of rightful meditation, would that invite a partial or total disaster for that person.

Kah chit na ubhoi bibhrasutah chhinna abhrama iva nashyati.
Apratishtho mahabano bimurahah Brahmanam Pathi. (G.6/38)

The vision of the golden sun soothing and giving in its own spirit. It needs to be contained within. Again, activate the will force and apply on the conscious vision of the 'Surya Deva' - the Sun as God. Invocation for him to come inside. Bring the soothing divine light within. Gradually pull it to the cardiac region. And now position it inside your heart. This is your supreme illumination in life. The divine light is now within your entity. Concentrate on that for a while or as long as you can visualize the color, the formation and the aura of that divine light. If you have love for God in any form now see Him within this cave of your heart as He has undertaken having been housed in you.

Arjuna was certain that the kind of questions and doubts have arisen in his mind as spelled out cannot be fully cleared by any sage or other forms, than Lord Krishna himself.

Etat mae samshayam krishna chettum asya asheshatah.
Tvat anyah samshayah asya chhettwa na hi upapadyatah. (G.6/39)

You are now in touch with your God, the Supreme. He is Sat, Chit and Ananda himself. Having his vision within the cave of heart requires to welcome Him within and take care of Him through the spiritual ways. The yogi will now have the option to continue in the worship of God through having him in the mind and containing him in the chosen message, words, visions or any kind of lila or play of actions in the world by him. The best option is to identify somewhat a relation or connection or interaction with him or his consciousness. This begins with the spirit of realization of God within the empirical personality.

Sri Bhagavan Ubacha:

Na eva iha na amutra binashah tasya vidyatae.
Na hi kalyanakrit kah chit durgatim tatah gachhati. (G.6/40)

Lord Krishna while responding to the questions raised by Arjuna, said a yogi remains on the pathways of wellbeing and remains chosen even if fallen to certain lower mindsets.

God is not away from you as Lord Krishna offers suggestive hint to Arjuna that God is here, with you, within you. The question boils down to the point how do you understand that God is here with you or God is present within you as your eternal friend in life. God is your 'Sakha', the true friend. God has so many identities. Consider him as father. He is your father. Consider him as your mother - he is your mother. Consider him as your friend - he is your friend. Consider him as any other relation - he is that. He has so many identities

to present.

Lord Krishna continues saying a deviated yogi achieves the heavenly shelter and then enjoys divine company of spirit as a subtle consciousness and if rebirth occurs it comes of nice family in the context of the world.

Papya punyakritam lokah anushitva shashvati samah.
Shuchinam shrimatam gaehae yoga bhrashtah hi abhijayatae. (G.6/41)

Whatever be your thoughts of your God, whatever be the consideration for him, be that way connected to him. If you consider him in any particular form, it is his way and grace to remain with you in that form in all situations, in all contexts. If you believe that he is your father or any other relation, he stands as that. The way you have created your faith and love for God, maintain that.

Alternatively, the rebirth takes place in the house of great sage or person with the spirit of god realized mainstream of the flow of consciousness through the wisdom of life.

Athaba yoginam eva kulae bhabati dhimatam.
Etad dhi durlava taram lokae janma yat idrisham. (G.6/42)

The first phase of meditation is over with the identity of God within and with the perceptive understanding of the same in most of the time. God can be and should be kept in mind in works, thoughts and interactions. He is always there as the spirit within. He is always a companion of the person in the functions of life. It is difficult but needs to be achieved as a stage of attainment. God is the true spirit within. He is the true guide from within. He shows the pathways for life from within. He is a realistic and empirical identity. He is the soul. He is the real self within. God is aligned as an invisible force within. He is eternal- does not have any beginning. He will not have any end as such. He is present within the system and in the case of the world, his presence be felt. As if he is the energy in the form of the heat of your body. He is there in your vision take his view as the cosmic memory and try to remember God in all situations actions thoughts of life.

Now, the yogi needs to proceed for the next step of the session. In the next step of internalization, the yogi needs to follow the spiritual pathways of the course. The spiritual pathway is now open for the yogi to follow within to achieve the point.

Lord Krishna continues saying the knowledge of previous life and the purposeful orientation makes the person advanced in the spiritual attainment.

Tatra tam buddhi samyogam labhatae pourba dehikam.
Yatatae cha tatoh bhuyah sam siddhoh kurunandana. (G.6/43)

Transcendence: It is now the course of transcending the objective and material barriers in life and attain the spiritual consciousness as the focus and objective of life. The entire process now is the one which has in the beginning repetition of the entire process of pranayama. Thus the yogi needs to do the pranayama in a way that shall do the enriching of the entire state of the spiritual process and then allowing the consciousness undertake the principle of having been adapted to the spirit and facts of living and then inculcating in life in a long term journey. The course of actions initiated as such is that the life and actions of individuals form the composite core of the persons and make out of the existential ingredients The elements which have already been tuned to God are already factors of the spells of realization at each plexus of learning in a way that is adaptive.

The yogi attempts in the manner of inner awakening knows about the salient features of god realization and performs yoga to attain fresh realization faster.

Purba abhyasena tena eva hriyatae hi abashah api sah.
Jijnasuh api yoga asya shabda Brahma atibartatae. (G.6/44)

The journey for transcendence thus begins with the entire set of activities as is done in this process of waking up. The cosmic energy is full of all potent lives inside the inner center, aligned with the entire body system. The store of energy is under supervision and control of the Cosmic Mother. The Cosmic Spirit rises

up through the pathways of Sushumna or the vertebral column. Here is the channel that ranges from the tail end of the backbone up to the point of junction with the brain. The stimulation occurs with the Prana vayu (vital air), drawn within by the art of pranayama. The stimulation reaches Muladhara at the end inner point of vertebral column. Then only the energy is released by the divine mother to sustain the new identity of life.

Thus the person who became deviated from the path of yoga in the previous life may get the consciousness sharply tuned to god and realizes the divine spirit in the best process and attains divine liberation.

Prayatnyat yatamana astu yogi shuddhah kilvishah.

Anenah janma sam siddhoh tatoh yati param gatim. (G.6/45)

When the step of visualization starts, you see a ball of light, made of air only, in golden color. This golden ball of light, considered a ball of air now, may proceed upward for the journey of transcendence. Help the process to stimulate with the silent internal chanting: 'OM BHUOH'; The golden ball of air now grows high. It crosses the boundaries of Muladhara and reaches the level Swadhisthana. The moment this golden ball reaches and attempts to cross Swadhisthana you may feel stimulation in the renal and the factors of sex in it. In fact, the sensual instincts can be easily crossed over with the consisting chanting and sense of God within. The ball of light and air proceeds further to the navel region or belt region. At Manipura, the navel, you have a crossroad.

A yogi is way ahead of others - a noble person, and realises divine truth in the way of meditation or any dedicated work, even sustained craving for god.

Tapasvibhyah adhikah yogeh jnanibhyah api adhikah matah.

Karmibhyh cha adhikoh yogi tasmat yogi bhaba Arjunah. (G.6/46)

With consistent chanting you cross it over and the golden ball of light and air grows up and up with concurrent chanting and remembering God. This reaches now at the plexus of 'Anahata' which is at the cross section with the sensory connection with the heart. At this stage, chanting within changes to 'Om Namah Shivayo Namah'. The spiritual consciousness as the ball of light and air now moves to the level of throat 'Vishuddha Plexus'. Chanting thus continues along with the thoughts of God within. It is thus heading further upwards.

Anyone who does the rightful practice of meditation with another person as on for a member of the community of wise person attains realization quicker and sharper.

Yoginam api sarva esham matgatae antah aatmanah.

Shraddhavana bhajatae yohmam sa mae yuktatamoh matah. (G.6/47)

With the chanting and thoughts of God continued, the force of realization now crosses the throat region and completes the journey through the vertebral column in the 'Sushumna way'. Thus, with this chanting, it reaches 'Aajna Chakra'. At this level of the forehead or the 'Aajna Chakra', the chanting within changes to: 'OM Namah Bhagavatae'. This would push the consciousness through the materials of the brain up to the physical limit of the top bony cover, the skull. With chanting and God in consciousness, the yogi would push the spiritual ball up further. This ball of air and light would thus find its way further upward to the atmosphere and find its pathway out. There is a spiritual orifice, the 'Brahma Randhra'- a microscopic orifice at a central point of the skull. This makes the way out. The individual consciousness now merges with that of the cosmic.

The yogi now reaches state of 'Samadhi'- oneness with the spiritual identity of creation. Gradually, the person now recognizes the spirit of oneness, yet having distinct physical identity. The person connects now with God and develops affirmation: 'Tat Tvam Ausi' - It is you who get revealed through me. You have discovered your spirit in me. You alone exist in this creation. This empirical self is now his eternal identity in spirit with God who resides within.

In the chariot of Divine Mantra : Mantra be thought of as that of the system of a monastery or a temple of God where the master takes up important components of lessons for understanding and practice in life. The mantra thus understood in the right sense of the term thus make it evident that it is one of the most important elements of spiritual practice that the person with the quest of God can actually have in practice and can get involved in that for the betterment of the human condition in the earth.

Again, along with the mantra or apart from that if a person leaves aside thoughts of any other thing and gets totally engrossed in the thoughts of God, then the person gets blessed with the support or the total care of God. Thus, focused thinking of God is an important element and a strong way forward with the spiritual and intrinsic urge of the person towards wishing the attention, grace and vision of God. The earth system being fully guided by the considerations of the human- scale that are not only oriented to but are overwhelmed by the ideas spiritual to God. It is the intrinsic understanding of life that can really make the world spiritually guided.

Transformations in Life : In the design of God, this not only that lives are only taken care of. But in the true sense of the term, it is considered that the spirit of divine intervention in the world is to reorient the human actions and the pathways of movement to life, that the aspects of divinity which connects with every element of creation are truly those that do touch upon the lives of the humans and others in the world. As such, the factors of life are given a creative thrust.

Aa Brahma bhubanah lokah punah aabartinoh hi Arjuna.

Mam upetyatu kounteya punah janma na bidyatae. (G.8/16)

The need is to understand earnestly the fact of God having been involved in the functions-activities-revelations and emergence of thoughts, perceptions or the material form of rational understanding. The system of thoughts that human being maintain is that of the direct relations between cause and effects. We have assumed that the entire creation is just for whatever is happening in continuity. Time now is the prime focus in that. With time now being the prime focus, man lives on existential values.

Aushabdam ausparsham aurupam aubyayam. Tatha auras am nityam augandhavat chayat.
Aunadi Aunantam mahatoh param Dhruvam nichayay tat mrityamatpramuchhyatae.

(Katha.U. 1/3/15)

The values and attributes that drive the existential thoughts are cardinal in the scientific way of looking at lives lived. The scientific view of life is said to be rational in nature. The rationality is actually based on the empirical understanding in life and the context that supports that understanding. It is material in nature. The material context is often considered as that of commercial in nature. It involves the principles of give and take. Any gesture, any support, any act of well-being, any work done or any input a person can offer in the context of the world has to be reciprocated either squarely or even at a higher degree. It is this, the basic principle, which applies in human relations and in the context of every human aspiration, prayers or any kind of fulfillments in the human design as prayed for.

Sahasra yuga paryantam yat ahah Brahmanoh biduh.

Ratrim yuga sahasram tarn tae ahoratro bidojanah. (G. 8/17)

The supreme is thus expected to contribute things of desire as the offers done through worship, puja or nibedanam to him in any form. It is thus the human consciousness which acts as the elemental commerce in

this relation that a person wishes to establish with God. The supreme is so much spread out in the cosmic existence that its actual impact of being present everywhere gets actually denied eventually. The universality of divine on earth is thus a matter which requires an elevation from the conditions and spirit of human essence in the larger sense. Human spirit thus requires to be drenched in the spirit of divinity in the context of a particular situation, time frame, area, zones and the elemental consciousness of human existence on earth. Thus, in order that he is revealed, you have to meditate.

Abyakta tat byaktayoh sarvah prabhobo antoh aagamae.

Ratra samagamae praliyantae tatra eva abyakta samgnakae. (G. 8/18)

The infinite identity of the supreme is such that words cannot really express Him in its usual manner. Words carry meanings in the human sense of the terms. It cannot transcend the limits and barriers of the human sense in ordinary context and situation. Thus, the very basis of the expressions and communications in human sense gets mixed with human aspirations and understanding. Whenever a person pursues seriously the spiritual path and eventually attains the meditative state of the mind, then the possibility emerges. It becomes possible for a human being at that context that the aspirations are examined in the backdrop of the realities of the world in general and that of the person in particular. It is thus the very basic approach that human person should pursue where the particular understanding of the person merges with the wholesome consciousness of the cosmic system. It is thus the wholesome which gets the touch of the supreme spirit in a context that has its own factors and specialties of understanding. This is actually the context of realization of God in the context of the world at a definite time space. Thus, the aspirations echoed in the human context are actually transformed into the items of consecration to God. It is when the divine grace in the form of realization comes in the human context.

Manifestation of the Supreme : With this kind of transformations initiated as a process in the human context, the aspirant turns into a devotee of God. Devotee is someone who is in a position to garner love for God. Love for God needs to be ushered in such a way that it is only absolutely unidirectional. Love for God should never be associated in any way with any kind of desire or expectation. Whether it is something expected of the world or that of something of the kind of eternal timeless identity, it is to be abandoned.

Bhuta gramah sa eva ayam bhutva bhutva praliyatae.

Ratra aagamae abashah patro prabhabati ahah aagamae. (G.8/19)

In the design of the supreme, everyone is of equal importance and identity. But someone who has developed a little bit of love for God is sure to have secured a special position in the framework of God in this universe and as such would be most specifically garlanded with the blessings for having gradual realization and thus in a way to have the universality of God understood in the right sense of the term.

Vayuh yatha ekah bhubanam prabistho. Rupam rupam pratirupah babhubah.

Ekah tatha auntah aatmah. Rupam rupam pratirupah bahih cha. (Kath.U.2/2/10)

Thus, the devotee understands the need for faith in his universal presence. Faith as such makes the elements of love stronger and more lasting. Faith in God gradually makes the devotee understand that God is omnipresent. As we understand the presence of air everywhere, God is present everywhere. He is present within every person in the form of Atman. Oh devotee, look within with pure love and devotion to discover Him and to be with him.

—o—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st December 2024
Agrahayan–1431
Vol. 22. No. 8

REGISTERED KOL RMS/366/2022-2024
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ১লা ডিসেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ৮ই ডিসেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.